খেয়াল

(দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীকালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, বি, এ,

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

সোদর-প্রতিম

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু।

ধীরু!

ছেলেবেলায় আমায় ও আমার লেখা বেশ ভালবাস্‌তে, তবে এখন ছেলের বাবা হয়েছ ব'লেই বোধ হয় নিজের ছেলেবেলাকার কথা আরবা-উপন্যাসের কোঠায় তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছ। কিন্তু তুমি থাক্‌লেও আমি তা থাক্‌তে দিচ্ছিনা। তাই আজ এই **"খেয়াল"**,—আমি চিরকালকার খাম-খেয়ালি তা-তো তুমি জান,—তোমার কাছেই ধর্‌লুম। কারণ আর বল্‌তে হ'বে না বোধ হয়,—তথাপি না হয় একবার বলি। কারণ—আমার **"খেয়াল"**কে তুমি পায়ে দল্‌তে পার্‌বে না, অপরে যাই করুক না কেন। ইতি

লাভপুর—বীরভূম।
তারিখ ৩১শে বৈশাখ।
সন ১৩২৭ সাল।

তোমারই প্রীতিবদ্ধ

কালী।

লেখকের নিবেদন

প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়,—যে বই ছাপাবার সময় সকলেই —অন্ততঃপক্ষে প্রথম প্রথম ব'লে থাকেন, যে 'বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধে পুস্তক প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছি'; কিন্তু আমি সে কথাটা ব'লে সত্যের অপলাপ ক'রতে পারলুম না। আমার এই অসম-সাহস দর্শনে বন্ধু-বান্ধবের দল—ভীত, চকিত, ও চমৎকৃত! তবে একজনের সম্বন্ধে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। বন্ধুবর—"বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতির"—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,—সাহিত্যরত্ন, আমার এই গল্পগুলি পড়ে' সেগুলিকে ছাপাখানায় পাঠিয়ে দেবার জন্য আমাকে ক্রমাগতই উত্যক্ত ক'রে তুলেছেন। তাই আজ আমার **'খেয়াল'**—তাঁ'রই মনস্তুষ্টির জন্য ছাপাখানার আশ্রয়ে।

কি রকম ভাবে তিনি আমায় একটানা খোঁচা দিতে আরম্ভ করেছিলেন তা'রই নমুনাস্বরূপ—তাঁর শেষ পত্রখানা—বেচারী **"খেয়ালের"** মাথায় চড়িয়ে দিলুম। আশা করি আমার সমস্ত অবস্থাটা বিবেচনা করে' সাধারণে আমায় মার্জ্জনা ক'রবেন। শেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি—বিশ্বকোষ প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীমান্ হরিচরণ মিত্রের কাছে,—তিনিই এই বইএর প্রুফ দেখে' দিয়েছেন। ইতি

লাভপুর, (বীরভূম)	বিনয়াবনত
১৩২৭ সাল ৩১শে বৈশাখ	শ্রীকালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়

একখানা চিঠি

সারদা-কুটীর
কুড়মিঠা, (বীরভূম)
১লা চৈত্র, ১৩২৬।

প্রিয়বরেষু :—

পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আপনার গল্পগুলি প্রকাশ করিতে কেন যে ইতস্ততঃ করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। এ বিষয়ে অনেকবার, অনেক কথাই বলিয়াছি, তথাপি হয় তো 'বাসি' হইলে কাজে লাগিতে পারে,—এই বিবেচনায় এবারেও দুই চারিটি কথা না বলিয়া পারিলাম না।

দেখুন, আমি আপনার গল্পের ভাল-মন্দ লইয়া বিচার করিতেছি না : যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে আর যে কিছুর অভাব থাকে—থাকুক, বাঙ্গালা সাহিত্যে (ছোট, বড়, মাঝারি) গল্পের অভাব আছে,—এ কথা অতি বড় শত্রুও বলিতে পারিবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে—"বরং বলিতে হয়, বাঙ্গালা-সাহিত্য 'গল্পরাশি'-ভারে কিছু পীড়িত!" তবুও যে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি—তার কারণ?—এ পত্রে সেই কথাই বলিব। আচ্ছা, বলুন দেখি—আজ জয়দেব, চণ্ডীদাসের

দেশে—সাহিত্যের অবস্থা দেখিয়া আমাদের—অন্ততঃ ভদ্র বলিয়া পরিচয় দিবার জন্যও লজ্জিত হওয়া উচিত কি না? একে তো বীরভূমির সাহিত্যিকের সংখ্যা "এখনকার সমাজে, বের' করিনা লাজে, পাছে * * খেতে হয়" গোছের; এ-র ভিতরেও আবার দুই-একজন ভিন্ন সকলেই যেন—অবসাদ-গ্রস্ত,—'বেদব্যাসের বিশ্রাম' চালিতেছে! এই অবস্থাটা ভাবিলেই বুঝিতে পারিবেন—আমার অনুরোধের কারণ কি?

আমার অনুরোধের কারণ—আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী-ধারী—শিক্ষিত-মানুষ; তার-উপর সাহিত্যানুরাগী, সুতরাং আপনাদিগকে আসরে নামাইতে পারিলে একটা কাজ হয়। আমার মনে হয়—এই অনুরাগ লইয়া যদি চেষ্টা-যত্ন করেন, অনু-শীলনে শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি থাকে, তবে সাধনায় সিদ্ধিলাভ আপনার পক্ষে বিশেষ দুরূহ বা দুরাশা নহে। চাই কি—আপনারই লেখা একদিন বাঙ্গালা-সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদরূপে পরিগণিত হইতে পারে। আপনার নাটক পড়িয়া তো সেদিন এই কথাই বলিয়া আসিয়াছি। ইদানীং ঐ যে দিল্লীশ্বর মহম্মদ শা'কে লইয়া নাটকখানা লিখিয়াছেন,—অবশ্য আমার সমালোচনার কোনো মূল্য না থাকিতে পারে, এবং রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতাও খুব কম,—তথাপি এ-কথা আমি বলিতে পারি যে, আপনার ঐ

নাটক অভিনীত হইলে—বর্ত্তমান কোনো রঙ্গমঞ্চই মর্য্যাদা হারাইত না।

পুঁথি বাড়িতেছে,—বোধ হয় বিরক্ত হইতেছেন! আর না—আমিও বিদায় হই। শেষে আবার বলিতেছি—আপাততঃ গল্প-কয়টা প্রকাশ করিয়া ফেলুন। বীরভূমে সাহিত্যের বাজারে এখনও সমালোচনার যাচাই'য়ের সময় আসে নাই। এখন জমা হউক, বাছাই পরে হইবে। সুতরাং সঙ্কোচের কোনো কারণ নাই। আপনি "বীরভূম-বিবরণ ২য় খণ্ড" পড়িয়াছেন? মহারাজ-কুমার—লাভপুর-কাহিনীতে কি লিখিয়াছেন—দেখিয়াছেন? লাভ-পুরে সাহিত্য-চর্চ্চার সূত্রপাতে আনন্দিত হইয়া,—আশায়, ভরসায়, বিশ্বাসে, তিনি যে কয়জন নবীন-সাহিত্যিকের নাম করিয়াছেন, দেখিবেন—আপনি তাহার মধ্যে একজন। এই আশা-ভরসা, এই বিশ্বাস—অপাত্রে ন্যস্ত হইয়াছে, ইহা মনে করিতেও আমার কষ্ট হয়। "বীরভূম-বিবরণের" মুখ চাহিয়াও আপনার কিছু করা উচিত। সস্নেহ-ভালবাসা গ্রহণ করুন। কুশলে সুখী করি-বেন। আমি ভাল আছি। ইতি

আপনার স্নেহবদ্ধ—

"সাহিত্যরত্ন"

খেয়াল

১

অদৃষ্টফের

পাড়ার লোক,—চেনা লোক—আমাকে শিমূলের ফুল আখ্যা দিয়েছিল,—অপবাদ—আমি দেখ্‌তে-শুন্‌তে বেশ ফুট-ফুটে, টুক্ টুকে,—অথচ নাকি কোনো গুণ নাই, যেমন শিমূলের ফুল দেখতে রাঙা টুক্ টুকে অথচ গন্ধবিহীন। এই এত বড় কবির উপমা আমার উপর যে কেন বর্ষিত হোল তা' সঠিক বুঝতে পারি নাই। তবে যা'রা আমাকে ছেলে বেলায় শিমূল-ফুল বল্‌তো, আমার এই পরিণত-বয়সে গোলাপ-ফুল না বললেও শিমূল-ফুল বলবার স্পর্দ্ধা আর তা'দের ছিল না। কারণ যা'রা একদিন বড় গলায় বলেছিল এ ছেলের লেখা-পড়া অসম্ভব, চোখের সামনে তারাই দেখ্‌তে পেলে যে বিশ্ববিদ্যালয়—একে একে তার যতগুলি পরীক্ষা ছিল, সব

গুলিতেই আমাকে সফলতার ছাপমারা তকমা দিতে কার্পণ্য করলে না—বা কুণ্ঠিত হলো না। তারপর বি, এল, পাশ ক'রবার পর গাউন ঘাড়ে ক'রে যখন সদর-আদালতে বেরুতে লাগলুম্, তখনও ততটা গোলমাল বাধে নাই।

উকীলদের মত চাপকান আচকান এঁটে না বেড়িয়ে, নব্য-ভব্য যুবকদের মত কোট প্যাণ্টালুন ও নেক্‌টাই নিয়েই বেরুতুম্। চেহারাটা ছিল ভাল—আর পয়সার ও অভাব ছিল না, তাই সাহেবী পোষাকে ঠিক্ সাহেবের মতই দেখাইত, যা একটু গরমিল হোত' কেবল তাম্বুলরাগ-রঞ্জিত অধরের। ইংরাজীটা বলতে পারতুম্ ভাল,—আর চিরকাল সাহেব অধ্যাপকদের নিকট পড়াশুনো ক'রে বলবার আদব-কায়দাটাও তাদের মত অনেকটা দাড়িয়েছিল। বাল্যকাল হ'তেই একটু ফিটুফাটু থাকা অভ্যাস ছিল, এখনও সে অভ্যাসটা পোষাক-পরিচ্ছদে, ভাব-ভঙ্গীতে, কথা-বার্ত্তায়, আদব-কায়দায় ঠিকই রেখেছিলুম। মফঃস্বলের সদর-আদালত অধি-কাংশই—সে-কেলে জরাজীর্ণ উকীলে পরিপূর্ণ। আমার বয়সী যারা ছিল তাদের চেহারা আমার মত ভাল ছিল না, বেশে পারিপাট্যও ছিল না, আমার মত ইংরাজী কায়দায় কথাবার্ত্তাও কেউ কইতে পারত না; কাজেই নবীনদের মধ্যে লোকের নজর

প'ড়ল আমার উপর। আমিও মা-কালীর কৃপায়—দশজনের আশী-র্ব্বাদে, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে একটী-আধটী করে মোকদ্দমা পেতে লাগলুম্। হাকিমরাও আমার উপর সদয় হয়েই হোক—সুঠাম চেহারা ও সুন্দর বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়েই হোক—আমার টান্ টেনেই জেরা করতো, এমন কি আইনের খেই-হারা হলেও খেই ধরিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হোত না; কাজেই এমন বোকা আমি নই—যে এরূপ সুযোগ পেয়েও মোকদ্দমা হারিয়ে ফেলবো। একটার পর একটা করে কেস (Case) জিত্‌তে সুরু করলুম্—বাজারে নাম বেরুতেও সুরু হোল'। উকীল কামরায় (Bar Library) সমব্যবসায়ীরা ইসারায়-ইঙ্গিতে ঠাট্টা করতে বাকী রাখতো না; কিন্তু কাউকে বা বগে ঘা-দিয়ে, কাউকে বা আঁতে ঘা-দিয়ে—কারণ চিরকালের নাম-জাদা ফাজিল আমি—এমন সন্ধি-সন্ধি কথায় উত্তর দিতুম, যে কিছু দিন পর কারও কিছু বলবার ইচ্ছা থাকলেও বলতে সাহসী হোত না। যাক্ বার-লাইব্রেরীতেও শত্রু বধ হতে বেশী দেরী হোল না। সদর-আদালতে, বন্ধুমহলে, গ্রামে—পরোক্ষে প্রত্যক্ষে এত দিনে যে শিমূল-ফুলের অপবাদটা দূর হোল এই যথেষ্ট! তবে গোলাপ-ফুল ও বলতো না—আগেই বলেছি, তার কারণ এখন মনে হয়, যে তুলতে গিয়ে পাছে হাতে কাঁটা ফুটে! সাধারণের

(Public) কাজেও আমি বিশেষ ভাবে যোগদান করতুম—সেটা শুধু আমার একটা চাল'। (Policy)। আমাদের সহরে একটা ক্লাব ছিল, তার (Joint Secretary) আমি ছিলুম্। বালিকা-বিদ্যালয়ের, হাসপাতালের, থিয়েটার পার্টির, আরও ২।৪টা বিশেষ-বিশেষ মণ্ডলীর আমি একজন মোড়ল ছিলুম। এক কথায় আমাদের সহরটাতে পাঁচজন মিলে কোনো কাজ করতে হ'লেই—আমি একজন তার মধ্যে প্রধান পাণ্ডা। আমার যে চালের কথা বলেছি—সেটা হচ্ছে একটা নাম বাহির করবার ফন্দি আর নাম জাহির হ'লেই প্র্যাক্‌টিস (Practice) জমবার বড় সুযোগ—কাজে কাজেই আমি কোনো রকম কাজের ভার নিতে কোনো দিনের জন্যই কুণ্ঠিত হই নাই।

একদিন কেবলমাত্র বিছানা হ'তে উঠে—বাইরের ঘরে এসে, আমার ছাত্রজীবনের গড়গড়াটির আল-বোলে মুখ লাগিয়ে সবে এই ২।১টি টান দিয়েছি, অমনি দেখতে পেলুম ৩।৪ জন লোক আমার দরজার ডানদিকে যে মারবেলের উপর "সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, উকীল—জজ-কোর্ট, লেখা আছে" সেইটে পড়তে আরম্ভ করেছে। একজন হয়তো খুব মেধাবী, তাই সে চট্‌পট্‌-পড়ে' হজম করে' সমস্ত লোকদের বললে—"হাঁ। হাঁ। ইনিই

সেই সতীশ বাবু—যাকে আমরা চাই। ইনিই তো জজ-কোর্টের উকীল দেখছি।" আমার তখনও 'তরুণারুণ নয়নযুগল আধ মুদিত অলসে'—তামাকের ধোঁয়ার কুয়াশায় সমাচ্ছন্ন হয়ে' লোক-গুলিকে চিনতে পারছিল না—তবে মন আমার মক্কেল বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া লইয়া বেশ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে কাল্য-ব্যাপৃত ওষ্ঠদ্বয় কাজে আরও মনোযোগী হইল। দেখিতে দেখিতে ভদ্রবেশধারী ৯ জন লোক আমার ঘরে হন্ হন্ করিয়া প্রবেশ করিলেন। যিনি মেধাবী, যিনি সতীশ বাবু যে জজকোর্টের উকীল স্থির করিয়াছিলেন, তিনিই শূন্য চেয়ার দেখিয়া অবাধে স্থান পূরণ করিলেন এবং আমার দিকে লক্ষ্য না করিয়াই কিম্বা আমার কোনো কথার ধার না ধারিয়াই—সঙ্গীগণকে পাশাপাশি যে চেয়ারগুলি ছিল—তাহাতেই উপবেশন করিবার ইঙ্গিত করিলেন! ইঙ্গিত করিয়া ক্ষান্ত হইলে তো কিছু বলিবার ছিল না; কিন্তু গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'ওহে জগতে প্রাকৃতিক নিয়মেও বটে, আবার বৈজ্ঞানিক নিয়মেও বটে—কোনো স্থান খালি থাকবার উপায়টি নেই, সতীশ বাবুর চেয়ারগুলো তবে খালি থাকে কেন? বসেই পড না ছাই"। আমি তো অবাক্। একাধারে সুরসিক ও বৈজ্ঞানিক! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্—যাক্ এই অদ্ভুত অভ্যাগত মহোদয় আমাকে

যেন এতক্ষণ পরে দেখ্‌তে পেলেন—আমার পানে তাকিয়েই বল্‌লেন—"আপনিই সতীশ বাবু ? কারণ আপনার চেহারাটা ঠিক সতীশ বাবুর মতই !" তিনি যে দার্শনিক তাও বুঝলুম্। কি বিড়ম্বনা ! প্রাতঃকালে উঠিয়াই এ আবার কি এক নূতন উৎপাত ! আগন্তুক—"সতীশ বাবু, আপনি তা হলে প্রস্তুত ?" আমি তো গাছ হইতে পড়িলাম ! চিনি না, জানি না, জীবনে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না,—তা সে কেমন করে এরূপ অদ্ভুত—অর্থহীন কথা বল্‌তে পারে ? অথচ একটা কিছু বলে উত্তর দিতে হবে। বড় আশা করে যে মক্কেল ঠাওর করেছিলুম্ সে—আশায় তো জলাঞ্জলি দিতে হ'লো, উপরন্তু একটি ভাবী আশঙ্কায় আমার মন-প্রাণ শিউরে উঠলো। মুখের নল মুখেই রহিয়া গেল, উত্তপ্ত কলিকা বিশ্রাম লাভ করিয়া মলিন হইয়া গেল, গড়গড়ার বক্ষোভেদী অবোধ্য ভাষা—যাহা এতক্ষণ অনর্গল আমার সুখ-দুঃখ, অতীত ও বর্ত্তমান, আশা ও নিরাশার সুরে—সুর মিলাইতেছিল—সহসা কিসে যেন তার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। আমি সাত পাঁচ ভাবিয়া আইনের কষ্টিপাথরে ফেলিয়াও আগন্তুক-দের স্বরূপ নিরূপণ কিম্বা উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইলাম না। আমার বিদ্যাবুদ্ধি হায়রাণের পাষাণে প্রতিহত হইয়া—

শ্রীহীন হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ চোখও বিবর্ণ হয়ে উঠল। আধমুদিত চক্ষু জোর করে অতিরিক্ত বিস্ফারিত কর্‌লুম্, প্রাণের প্রতি তন্ত্রীতে লোহার মুদ্গর দিয়ে ঘা দিলুম—তারা সঠিক সংবাদ দিতে পারে কি না—কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হোল। যা হোক আমি অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করে বললুম্—মহাশয়দের কি হেতু আগমন ও আমায় কিরূপে জানলেন—দয়াকরে বলবেন কি? আমি যে আপনাদের কাউকে কোথাও দেখেছি তা মনে হয় না। ১ম আগন্তুক—"অবশ্য আমাদের যে দেখেছেন সে কথা তো আমরা বলিনি। তবে আপনি শুধু 'প্রস্তুত কি না' জানতে চাই।"

আমার এবার একটা কথা মনে হলো যে লোকগুলো তো C. I. Department এর নয়। আবার ভাবলুম তাদের আমার সঙ্গে কি প্রয়োজন থাকতে পারে? অবশ্য কিছু দিন আগে Moderate Conference নরম দলের বৈঠকে আমি এখান থেকে Delegate প্রতিনিধি হ'য়ে গিয়েছিলুম্ বটে কিন্তু সেখানে তো আইনের বাইরে কোনো কাজ করি নাই কিম্বা কেহ করে নাই, যে আমার পিছনে I, B, এর লোক লাগ্‌তে পারে। আবার ভাবলুম্ হ'তেও পারে। এবার মনে মনে যা হোক এই একটা কিছু

ঠিক করতে পেরেছি বলে মনে একটু বল পেলুম। তাই গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলুম "মহাশয়, আপনার হেঁয়ালী আমি বুঝ্‌তে পারছি না—যদি দরকার কিছু থাকে—ভেঙ্গে বলুন, নয়"—আগন্তুক—"নয় আমরা ঘর ছেড়ে চলে যাব" কেমন সতীশ বাবু? আমি তো একেই জলে পুড়ে মরছিলুম, তার উপর মেজাজটা একটু চিরকালই কড়া। তাই নিজেকে সামলাতে না পেরে এই কথাই বলতে যাচ্ছিলুম। তবে অপ্রিয় সত্যটা আর আমায় নিজে বলতে হোল না, আগন্তুক বলে দিলেন। আমি শুধু বললুম "হাঁ, তাই।" আগন্তুক—"সতীশ বাবু, আপনি ছেলে মানুষ। তাই এত শীগ্‌গির চটে' যান্‌। অবশ্য বয়সের দোষ, কিন্তু তা হ'লেও আপনি উচ্চ-শিক্ষিত; ভদ্রলোক আমরা, কোথায় আমাদের আদর-অভ্যর্থনা করে' সভ্যতার মর্য্যাদা রাখ্‌বেন—না অন্যায় অসঙ্গত কথা ব'লে অসভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন। তা যাই হোক আপনি এটা স্থির জেনে রাখুন, যে আমারা কিছু আপ্‌নার এখানে থাক্‌তে আসি নাই, আর থাক্‌তে চাইলেই যে আপনি থাক্‌তে দেবেন—সে ভরসাও বড় নেই, তা আপনার কথাবার্ত্তার আর চাল চলনের ভাব দেখেই বুঝেছি। এই যে এতগুলো ভদ্রলোক আমরা এতখানি রাস্তা হেঁটে আপনার ঘরে এলুম,—আমরা তো বাঙ্গালী, আর আপনিও

ঠিক্ তাই—তবে নিজেকে যাই ভাবুন্ না কেন,—গড়গড়াটা এগিয়ে দেওয়া উচিত ছিল কি না? আচ্ছা, ধরে নিলুম আপনি কাউকে না হয় আপনার গড়গড়া দেন না, তা ছাই একটা হুঁকাতেও তামাক দেবার জন্যে তো চাকরকে বল্‌তে পারতেন! কেমন হে সরল?"

বুঝিলাম পাশের ভদ্রলোকটির নাম সরল; কিন্তু তিনি সত্য সত্যই সরল কিম্বা বাঁকা তা এখনও বুঝি নাই। সরল বাবু শুধু প্রথম আগন্তুকের কথায়—বিজ্ঞের কি বোকার জানি না—একটু হাসি হাসিলেন। আমি এই আগন্তুকের কথায় রাগ করিব কিম্বা তার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিব—সম্যক্ বুঝিয়া উঠিলাম না; তথাপি আমার বড় বিরক্তি বোধ হইতেছিল। তাই বিরক্তি-ব্যঞ্জক-স্বরে বলিলাম "মহাশয়েরা, আমি এখনও প্রাতঃকৃত্য কিছুই সমাপন করি নাই, সবে মাত্র—"

১ম আগন্তুক—"সবে মাত্র এই চারি কলিকা নিঃশেষ করিতে বসিয়াছি, কেমন সতীশ বাবু?" নিজেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। এ দিকে আমি ত চটিয়া লাল। ইতি মধ্যে কলিকা আমার মলিন হইল, কিন্তু আমার মনটিকে লাল করিয়া দিল। চটিয়া বলিলাম "দেখুন মহাশয়, আপনার ব্যবহার বড় অসভ্য।

চিনি না, জানি না তবে এ কিরূপ তামাসা। যান, দয়া করে আমায় বিরক্ত করবেন না।"

১ম আগন্তুক—বিরক্ত করবার ইচ্ছা আমাদের আদৌ ছিল না, কিন্তু আপনি যদি নিজেই বিরক্ত হতে চান, তবে আমাদের অপরাধ কি বলুন? আপনাকে জিজ্ঞাসা করলুম "কেমন প্রস্তুত?" আপনি কোনো জবাবই দিলেন না। এমন উত্তর করলেন শেষে—যাতে মনে হয় যে আপনি কখনও Logic (ন্যায়শাস্ত্র) পড়েন নি।

ক্রমশই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে আসছিল, তারপর এইরূপ অবান্তর বাক্য-প্রয়োগ সত্য সত্যই আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিল। দাড়াইয়া উঠিয়া বলিলাম "মহাশয়রা দয়া করে' এখনি আমায় পরিত্যাগ করে যান। বারবার বলছি আমায় বিরক্ত করবেন না। যান, দয়া করে চলে যান। সকাল বেলায় এ উৎপাত কোত্থেকে এলো।"

১ম আগন্তুক—"মশায়, আপনার এটা সকাল বেলা হতে পারে, কিন্তু মুখ্যু অভদ্র আমরা—আমাদের এটা সকাল নয়। তবে আপনি যখন বলছেন সকাল বেলা—তখন হতেই হবে, নইলে আপনি যে রকম একগুঁয়ে লোক—তাতে আপনার কথাটা যে সত্য

তা প্রমাণ করতে—আপনি হয়তো এখুনি অসাধ্য সাধন করতে বসবেন। কিন্তু মশায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—ঐ যে সাম্‌নে ঘড়ি নামক পদার্থটা টাঙিয়ে রেখেছেন কেন ? চাষা মক্কেলদের বাজ্‌না শোনাবার জন্যে—না আপনার আক্কেল বুদ্ধি গোল্লায় দেবার জন্যে ?" ভদ্রলোক নিজেও খুব একচোট হেসে উঠলেন—আর দলস্থ ব্যক্তিবর্গেরাও তাঁদের মুকুতা-বিনিন্দিত দন্ত বিকশিত করতে আদৌ ইতস্ততঃ করলেন না।

লোকটার স্পর্দ্ধা দেখিয়া এবং তার আসর বিশেষ সরগরম অনুভব করিয়া—ক্রোধে আমার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। অসহনীয় বাক্যবাণ সহ্য করিতে না পারিয়া খুব চড়া গলায় বলিলাম "মশায়রা, যদি ভাল চান—এখুনি আমার বাড়ী থেকে বের হয়ে যান"। আমার রক্তচক্ষু, কম্পিত দেহ কিম্বা বীর রসাত্মক কণ্ঠ—আগন্তুকের মনে চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতে সক্ষম হইল না। তিনি পূর্ব্ববৎ সহজ সরল ও নির্ভিক কণ্ঠে উত্তর দিলেন "মশায় এটা যে আপনার বাড়ী তার প্রমাণ কি ? আমরা বল্‌ছি এ বাড়ী আমাদের, আর এখানে আপনি এক জন Tress-passer ,—অতএব কোনো রূপ গোলযোগ না করে আপনারই এ বাড়ী হতে চলে যাওয়া উচিত, এবং আমাদের ইচ্ছা আপনি

তাই যান।" লোকটার নির্লজ্জতা আমার চোখের সামনে ডগ্ ডগ্ করে ফুটে উঠল। শেষে আমিই হাসিয়া ফেলিলাম। আমাকে হাসিতে দেখিয়া আগন্তুক বলিলেন "কি সতীশ বাবু, আর কাউকে ঘর হতে বের করতে চাইবেন"? হতে পারে আপনি একজন উকীল,—কিন্তু তা বলে ভাববেন না যে আপনিই "সবে ধন বাম-কান্ত।" এই শ্লেষোক্তি আমার কাছে বড়ই খারাপ বোধ হইতেছিল, কিন্তু নির্লজ্জকে জব্দ করিব কেমন করিয়া?—লজ্জাহীনকে জব্দ করিতে হইলে আগে নিজেকেই জব্দ হইতে হয়। এ ক্ষেত্রে আমারও দশা হইল ঠিক তাই। যাই হোক, মনটা তখন অনেকখানি কোমল পরদায় চলতে সুরু করেছিল, তাই কোমল স্বরে বললুম "মশায়রা আপনাদের অভি-প্রায় জানতে পারি কি?" এই বার সরল বাবু উত্তর দিলেন "অবশ্য অভিপ্রায় একটা আছেই এবং সেটা জানতেও পারবেন, কিন্তু আমরা আপনার সম্বন্ধে যা শুনেছিলুম তাই হোল দেখছি।" আমার সম্বন্ধে কোথায় কার কাছে কি শুনেছে জানতে আমার বিশেষ কৌতূহল হয়েছিল, কিন্তু পাছে আবার অপদস্থ হই—এই ভয়ে মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না। নিশব্দে যেমন ভাবে বসেছিলুম সেইরূপ ভাবেই বসে রইলুম। একবার

মাত্র ভাবলুম যে ইনি সম্পূর্ণ বাকা না হলেও নেহাৎ সরল নহেন।

সরল—"সতীশ বাবু, আমরা কলকাতা হতে আসছি। আপনাকে অনেক বার আমরা দেখেছি।"

আমি—"আপনারা অনেকবার দেখেছেন বলছেন, কিন্তু আমি যে আপনাদের একটী বারও দেখেছি তা মনে হয় না। আমার ত অন্ততঃ একবারও দেখা উচিত ছিল।"

১ম আগন্তুক—"উচিত তো ছিল, কিন্তু আপনার যদি সেই উচিত অনুচিত জ্ঞান থাকবে—তা হলে এত বড় একটা কাজ করে বেশ বেমালুম সব হজম করতে পারেন! ধন্য আপনার হজমশক্তি মশায়, আবার লোকে বলে কি না আপনি dyspeptic! ওহে সরল, বাবুকে চিঠি-খানা দাও"। সরল বাবু তাহার গ্লাডষ্টোন ব্যাগটী খুলিয়া আমাকে একখানি পত্র বাহির করিয়া দিলেন। খামের উপর বাঁকা হাতের মোটে দুই ছত্র লেখা। আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, হাত কাঁপিতে লাগিল, হৃদয় গুরু গুরু করিতে আরম্ভ করিল। লেখাটা কত দিনের পরিচিত, শুধু পরিচিত—না সুপরিচিত? কত মরমের ব্যথা, কত অতীতের কথা, কত সুখস্মৃতি, কত স্বপনের গীতি, এই দুই ছত্র লেখা

আমার চোখের সাম্‌নে বেশ সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করিয়া দিল ভাবিতেই কাঁদিয়া ফেলিলাম। আগন্তুকের দলতো অবাক্। আমিও আমার এই বিপরীত ব্যবহারে একেবারে মরমে মরিয়া গেলাম। এখনি যে "বজ্রাদপি কঠোরাণি" হৃদয় "মৃদুনি কুসুমাদপি" হ'তে পারে, ভাবিয়া লজ্জায় লজ্জাবতী-লতার মত বিবর্ণ ও শুষ্কপ্রায় হইয়া গেলাম। আমার এই অবস্থা দেখিয়া ১ম আগন্তুক বলিলেন "সতীশ বাবু, আমরা জানি যার হৃদয় যত কঠোর—তার হৃদয় তত কোমল। এতে আপনার লজ্জিত কিম্বা দুঃখিত হবার কোনো কারণ নেই। মনটা একটু বাঁধুন। গৌর-চন্দ্রিকায় যদি চোখ দুটী বর্ষণের ধারায় অন্ধ হয়—তা হলে মূল ঘটনা জানবার একটা মস্ত খেদ থেকে যাবে। খাম-খানটা খুলে পত্র পড়ুন, তার পর আমাদের অবশ্যই জান্‌তে দেবেন, আপনার অভিপ্রায়টা কি?" তার পর হাতের ঘড়িটী পানে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "নয়টা বেজে গেছে, দশটার সময় ফিরবার ট্রেন, অতএব যাহয় একটা কিছু মীমাংসা করে আমাদের বিদায় দিন।"

আমার ব্যস্ত হাত ইতিমধ্যে লেফাফা খুলিয়া পত্র খানি বাহির করিয়া ফেলিয়াছিল এবং ব্যাকুলিত চক্ষু আগ্রহাতিশয্যে মাতিয়া কাগজ খানির বুকের ভাষা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। পত্রে

সবে চারি পাঁচ ছত্র লেখা। প্রত্যেক অক্ষর, প্রত্যেক পংক্তি আমায় কোন্ এক সুদূরের পানে অবিরাম গতিতে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল—এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আমার সমস্ত প্রাণ পরিপূরিত করিয়া সোণার দেশে—স্বপনের কোলে আরাম ও আনন্দের মাঝখানে ফেলিয়া আমায় দিশেহারা, জ্ঞানহারা করিয়া তুলিল। চিন্তামগ্ন আমি—ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বিশ্বজগতের গরিমাময় সুখচ্ছবি কল্পনা করিয়া চিন্তা রাজ্যের রাজপাট্ অধিকার করিয়া বসিলাম। আমার বাল্য-জীবনের আনন্দ-পুত্তলিকা, কৈশোর-কাননের গীতি-প্রফুল্ল সারিকা, যৌবন-নিকুঞ্জের আধবিকশিত-মল্লিকা, আর বিদায়ের দিনের সুনির্ম্মল অশ্রুকণিকা—আমার প্রাণময়ী মানস-প্রতিমা—শ্রীমতি রাধিকার লিখিত পত্র! হায়, আবার কেন! আঁধার রাত্রে জীবনের পিছল পথে একা ছেড়ে দেয়েছিলে প্রাণ-হীনা, তবে আবার কেন? কর্দ্দমাক্ত কলেবর, শঙ্কিত হৃদয়, ব্যথিত বক্ষ, এখন আবার কেন? কি জানি নারী, কি তোমার উদ্দেশ্য!

আর আমি, আমিও তো একদিন যাকে বিস্মৃতির গভীর গর্ত্তে ফেলে দিয়ে কঠোর কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হয়েছিলুম, দুরন্ত সমাজের রক্তচক্ষুকে ভয় করে সুখ-সাধ সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে যাকে

খেয়াল

ভুলেছিলুম,—আইনের জটীল সমস্যায় ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড এর (Indian penal code) ঘূর্ণিপাকে পড়ে যাকে ভুলেছিলুম, ভুলতে বাধ্য হয়েছিলুম—আজ কত কাল পরে তারই হস্তলিপি কেন আমায় বিচলিত করলে ? চিতার আগুন নিবিয়ে কি ভস্মে পরিণত হয় না ? পাষাণের দাগ কি যুগ-যুগান্তরের প্রলয়েও মুছে যায় না ? তাই যদি হ'ত—তবে এই নির্ব্বাপিত ভস্মে পুনরায় ধূমোদ্গীরণ কেন, প্রাণের আভাষ কেন ? হয়তো বা বহ্নিকণা পাংশুপ্রচ্ছন্ন হয়ে ক্রীয়াহীন নিস্তেজ হয়—শুধু অনুকূল বায়ুর প্রতীক্ষা করে। কতদিন কত বায়ু কতদিক্ দিয়ে বহে যায়—কিছুতেই কিছু হয় না ; কিন্তু কে জানে কোন্ অশুভ লগ্নে—মানব-বুদ্ধির অগোচরে—আপনার অলক্ষ্যে সেই অনুকুল বায়ু ভস্মরাশি শূন্যমার্গে উড়িয়ে অগ্নিকণার স্বরূপ প্রকাশ করে' দেয়—সেও তার স্বভাব-সিদ্ধ ক্ষুৎতাড়ণায় তাড়িত হয়ে সন্মুখেই যে কোনো বস্তুকে পায়—উদরসাৎ ক'রতে দৃঢ়চিত্ত হয়ে উঠে। ক্ষণকাল পূর্ব্বে লোক-চক্ষুর অন্তরালে বিরাজমান অগ্নিকণা আবার ধু ধু জ্বলিতে থাকে। এ চিরন্তন ব্যপার—এর নূতনত্ব নাই—তবে নূতন পুরাতন শুধু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের উপর নিভর। যুগ-যুগান্তরের প্রলয়—পাষাণের দাগ মুছে ফেলে না—শুধু জঞ্জাল

দিয়ে আবৃত করে রাখে—কোন এক দিনের খরধার প্রলয়-বারি শুধু সেই আবিলতা দূর করে দেয়। নূতন গরিমায় নূতন আকারে আবরণ ভেদী দাগ আবার লোকচক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে উঠে। প্রজ্জ্বলিত আগুন কখনও নেবে না, দেওয়া দাগ কখনও মুছে না। এই কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করবার স্পর্দ্ধা আমার নাই—তবে এই কঠোর সত্য শুধু স্পষ্ট করে বলবার ক্ষমতা দুনিয়ার সকলেরই আছে; কাজেই আমার থাকা বড় বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

পত্রের ভাব ও ভাষা সহজ-বোধ্য হইলেও আমার কাছে বড়ই দুর্বোধ্য হইল। রাধিকা—এ কি সেই পাঠ্যাবস্থার রাধিকা—সে আজ এই পত্রের লেখিকা। এক মুহূর্ত্তে অতীতের সম্মোহন ছবি আমার মানস-নয়নে প্রতিভাত হইয়া আমার সমস্ত জ্ঞান লুপ্ত করিয়া দিল। জড়ভরতের মত নিশ্চল নিষ্ক্রীয় হইয়া—স্বস্থানে উপবিষ্ট রহিলাম। মুখে ভাষা নাই, বুকে উচ্ছ্বাস নাই, হৃদয়ে বল নাই, চোখের দৃষ্টি নাই, শিরায় রক্ত নাই—সব নিঝুম, নিস্তব্ধ। পরিপূর্ণ নদী—অথচ বক্ষে স্ফীতি নাই, চঞ্চলতা নাই, মাঝে মাঝে শুধু এক আধটা ঘুর্ণী। আমার এই অবস্থায় মেধাবী আগন্তুক স্থির থাকিতে পারিলেন না। সহানুভূতিতে

তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, ডাগর চোখ দুটী জলে ভরিয়া আসিল। আমার হাতে হাত রাখিয়া বলিলেন, "সতীশ বাবু, এখন আমার পরিচয় আর আপনাকে দেব না, তা হলে আরও অধীর হয়ে উঠবেন। তবে জেনে রাখুন যে রাধিকা পূর্ব্বে যেমন আপনার স্নেহের পাত্রী ছিল—এখনও সে তাই। সতীশ দা বল্‌তে এখনও অজ্ঞান। কথায় কথায় সে আপনার নাম করে। আমি তার কাছ্‌ হ'তে আপনার বিষয় সব শুনেছি। বোধ হয় স্বীকার করবেন—অকপটে সকল কথা প্রকাশ করবার চরিত্র-বল রাধিকার আছে, কেমন সতীশ বাবু?"

সরল—"পত্র তো দেখ্‌লেন সতীশ বাবু, এখন বোধ হয় জবাব দিতে পারেন—প্রস্তুত কি না?" আমি ভাবিলাম যে সকলের মুখে ঐ এক কথা, এমন কি রাধিকার পত্রেও ঐ 'প্রস্তুত কি না' আজ আমায় একেবারে অপ্রস্তুত করিয়াছে। কেন, কিসের জন্য আমায় প্রস্তুত হইতে হইবে, তাহা তো কেহ বলিতে চাহেন না, এমন কি পত্রের লেখিকাও সে সম্বন্ধে একেবারে নীরব। কেন, কিসের অপরাধে আমায় আজ-এতকাল পরে এই অপ্রাসঙ্গিক বাক্যের পরিপোষকতা কিম্বা প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে? অপরাধের শাস্তি তো বহুকাল যাবৎ ভোগ করে' আস্‌ছি, তবে

আবার এই নূতন আয়োজন কেন? এ সংসারে,—সমাজে—সকল স্থানেই কি সেই এক কঠোর ব্যবস্থা। যে মরে—তাকে তো কেউ বাঁচাতে চায় না, বোধ হয় বাঁচাতে পারেও না! তাকে না মারলে যেন সারা সংসারটার স্বস্থ্য হয় না। সম্পূর্ণ স্বস্থ্য হয় তখন,—যখন চিতার উপর তাকে শুইয়ে-আগুন দিয়ে তার যা কিছু সব ছাই করে দিতে পারে। তখন চতুষ্পার্শ্বের বাতাসটাও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। জ্বলে পুড়ে মরেছি, যন্ত্রণায় ছটফট করেছি, কেউ সান্ত্বনা দেয় নি, এমন কি একটি মুখের কথাও খসায়নি—তার বদলে চোখ রাঙ্গিয়েছে, কুটিল হাসির কোলাহলে কাণ ঝালাপালা করেছে, অন্যায় অপবাদে প্রাণে শত দাগা দিয়েছে, সাদা প্রাণ কাল করবার চেষ্টা করেছে—মরতে পারিনি শুধু আত্ম-সম্মান কিম্বা সরকারের আইনের ভয়ে। বুকের জ্বালা বুকে রেখে পালিয়ে এসেছিলুম—ভুলেছিলুম,—সত্য সত্যই ভুলেছিলুম—তবে আবার কেন? স্বপ্নের অলীকতা, জীবনের কঠোরতা, স্মৃতির তীব্রতা, বুঝিয়ে দিতে তবে আবার কেন? স্বহস্তে রোপিত লতা স্বহস্তে ছিন্ন করেছিলুম, দুরাশার আঘাত প্রাণের তন্ত্রী শতধা ছিন্ন করে-ছিল—সব সহ্য করেছিলুম, নিজের হাতে জল যোগানো সবুজ গাছের প্রস্ফুটিত কুসুমকে নিজেই পদতলে দলিত করেছিলুম—এ সবই

তো সইতে পেরেছিলুম। এ সব সইতে যে ক্ষমতার প্রয়োজন হয়েছিল—সে ক্ষমতা তো আমার ছিল, তবে নিমেষের মধ্যে আজ সেই শক্তি কোথায় অন্তর্হিত হলো! হৃদয়, মন, প্রবৃত্তি আমার যা কিছু ছিল—সবই তো ঘুমিয়েছিল, আজ এই অসময়ে কে আবার তাড়িৎ-প্রবাহে—তাদের জাগরণের পথে টেনে আন্‌লে! জানি না—বিচার-ক্ষমতা তখন ছিল না—তাই বুঝে উঠ্‌তে পারলুম না, যে এ লেখিকা—না লেখা! আমার সে সময়ের অবস্থা সোজা কথায় বল্‌তে গেলে এই বলা উচিত, যে লোকে মন-প্রাণ দিয়ে যাকে ভালবাসে,—যদি তাকে না পায় এবং পাবার সকল আশা-ভরসাই চলে যায়—আর কিছু দিন পরে সেই ভালবাসার বস্তুটি তাকে অপ্রত্যাশিতভাবে স্মরণ করে,—তা হলে সেই লোকের মানসিক অবস্থা যা হয়—আমারও ঠিক তাই হয়েছিল। সেই লোকে তখন সাত—সতের—যা কিছু ভাব্‌তে পারে আমিও তাই ভেবেছিলুম। কথাটা হয় তো খুব অন্যায় ভাবেই বলা হলো, কারণ সবারই তো এমন সৃষ্টিছাড়া ভালবাসা ভাগ্যে ঘটে উঠে না—আর ঘটে উঠলেও হয় তো এমন শাকার ফাঁক যায় না; কাজেই সকলে আমার ভাব-ভঙ্গী, মন—অমন বুঝ্‌তে পারবে না। তা আর কি করবো? সবাই সব কাজ বোঝেও না—আর বোঝবার দরকারও

হয় না। জঞ্জালও তো এই বিশ্বের বুকে কোথাও না কোথাও তার অপরিষ্কার মাথাটা গুঁজে রাখ্‌বার একটু জায়গা পায়—তা লোক-চক্ষের সমক্ষেই হোক আর নাই হোক্, আর সকল লোকেও তার কিছু খোঁজ খবর রাখ্‌তে চায় না.—তাই ভেবে না হয় যারা সঠিক বুঝলেন—না তাঁরা আমায় ক্ষমা করুন।

আমার তো তখন এই অবস্থা; কিন্তু আগন্তুকদের অবস্থা আমার ঠিক্ উল্টো। আমি নিষ্ক্রীয়,—তারা তখন কর্ম্মপ্রিয়, আমি অনাসক্ত—তারা তখন সংসক্ত, আমি অস্থির-চিত্ত,—তারা স্থির-চিত্ত, আমার লক্ষ্য ছিল না – তাদের লক্ষ্য ছিল। হয়, হয়, জগতে এই রূপই হয়। সরল ও বক্র, তরল ও কঠিন, দূর ও নিকট, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ, নূতন ও পুরাতন এবং Negative ও positive এই নিয়েই সমস্ত জগৎ দিবারাত্রি আপ্‌নার মনেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর এই বৈষম্যের মধ্যেই জীব-জন্তুরাও ছুটে চলেছে। কেউ কাউকে বাদ দিতে পারে না, আর বাদ দিলেও সংসার চলে না। এরই মধ্যে যে কোনো একটা কারণে হোক্—সেটা আমার বিবেকের আদেশ—কিম্বা প্রবৃত্তির তাড়না—কিম্বা আগন্তুকদের জবরদস্তি যাই বল,—দশ মিনিটের মধ্যেই তাদের সঙ্গে কলিকাতা যাবার উদ্যোগ-আয়োজন আমাকে সম্পূর্ণ কর্‌তে হলো। আমার পায়ে শিকল

বাঁধা গোছ করে' বাড়ী হতে আমায় ষ্টেশনে নিয়ে এলো। বেচারা Life-boat এর ষ্টীমারের কিম্বা লাঞ্চের (Launch) পিছনে থেকে যেমন চোখ কাণ বুজে পথ ঘাট না দেখেই অবিশ্রান্ত ছুট্‌তে হয়,—আমাকেও সেইরূপ আগন্তুকদের সঙ্গে ছুট্‌তে হলো। বিপদে এত কার্য্যকারী সেই নৌকা—ষ্টীমারের পিছনে থেকে এত বোকা,—এত পরমুখাপেক্ষী হয়ে উঠে, এই আশ্চর্য্য! যে আমি একদিন সকল বিপদ মাথা পেতে নিয়ে—পুরুষের মতই সমস্ত ভুলেছিলুম, কর্ত্তব্যে মন দিয়েছিলুম, সেই আমি আজ কিসের টানে—কার পিছনে বদ্ধ হয়ে এই আগন্তুকরূপ রজ্জুর ক্রমাগত টানে—নিজস্ব সবটুকু হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়লুম? হয়—দুনিয়ায় এমনিই হয় - যে টান্‌তে পারে—সময়ে টানের বেগও সে সইতে পারে, যে ছুট্‌তে পারে—সময়ে সে পড়তেও পারে।

যাক্—জ্ঞানতো ছিলই না, কথাও ছিল না। কেমন করে' থাকা সম্ভব? নিজের স্বচ্ছন্দ গতি তো ছিল না—যে নিজের বুদ্ধি-বিদ্যা-প্রবৃত্তি-বিবেক সবগুলিকেই ঘাঁটিয়ে তুল্‌তে হবে। - এমন 'পায়া ধরা' গোছ হয়েছি যে—যে দিকে শিকল টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সেই দিকেই যাচ্ছিলুম; তাতে অস্তিত্ব থাক্ কিম্বা লুপ্ত হোক্। মানুষের কেমন-তর স্বভাব জানি না—যদি ভাব্‌তে সুরু করে, তা হলে

কুল-কিনারা বলে' যে একটা কিছু থাকা সম্ভব—আর সেখানে গতি প্রতিহত হতে পারে—তা আদৌ মনে আসে না। আমারও তাই হয়েছিল—ভাল মন্দ ভাবি নাই তো—যে একটা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করে ফেল্‌বো, শুধু হেঁচ্‌কা টানের জোরে—আর তারই খাম-খেয়ালিতে চলেছিলুম—ভাল মন্দ বিবেচনা আদৌ করি নাই—করবার অবসরও পাই নাই।

ট্রেনে যে কখন উঠেছি, দুই চারিটি ষ্টেশন অতিক্রম করে কখন যে বর্দ্ধমানে এসে পৌছেছি—তা বুঝলুম ঠিক তখনই—যখন এক ঠোঙা খাবার নিয়ে সরল বাবু আমার মুখের কাছে ধরে' দিলেন। চোখ তুলে চাইলুম—অন্যমনস্কভাবে খাবারের ঠোঙাটাও হাতে নিলুম—কিন্তু লক্ষ্মণের ফল-ধরা গোছ হাতেই রইল। ভাব দেখিয়া সরল বাবু বলিলেন "সতীশ বাবু ব্যাপার কি? বাসা হতে বেরিয়ে যে আপনার খাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল।" আমি ঠোঙাটি বেঞ্চির উপর রাখিয়া বলিলাম "সরল বাবু আমায় ক্ষমা করুন, আমার চাঞ্চল্য দূর করুন, বলুন কি খবর, কেন আমায় এমন ভাবে কল্‌কাতা যেতে হচ্ছে, আমার কল্‌কাতা যাওয়ায় রাধিকার কি স্বার্থ,—আর সদল-বলে আপনাদের পাঠিয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসবার জন্যই বা তার এত আগ্রহ কেন?" আরও

হয়তো অনেক কথা বলতুম—এই যে এতক্ষণ চুপ করে ছিলুম সেটা সুদে আসলে উঠিয়ে নিতুম, কিন্তু বাধা দিল আমার চোখের জল—আর মেধাবী আগন্তুকের (তাঁর নাম এখনও জানিনা) ঠোঁট কাটা সমালোচনার ভয়। অথচ যাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া মনের আবেগ রুদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম,—তিনিই সটান্ বলিয়া উঠিলেন 'দেখ্ছ হে সরল, সতীশ বাবুর বদ্ অভ্যাস। যখন কথা কইবেন তখন যেন ষ্টিম রোলার (Steam-roller) এর 'ঘরর ঘরর' চল্‌ছেই, আবার যখন চুপ মেরে থাক্‌বেন—তখন যেন শীত-কালের সাপ গর্ত্তে ঢুকে আছেন—হাজার খোঁচা মার, হাজার ডমরু বাজাও, কানুর বেণু বাজাও—কিছুতেই নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দেবেন না। কেমন, ঠিক না সরল? তাঁর উপমা যেমনই হোক—তিনি নিজেই হাসিয়া উপমার সরসতা রক্ষা করিতে ত্রুটি করিলেন না। দুঃখ-ভারে চিন্তাজ্বরে জর্জ্জরিত আমি—এই সদাহাস্যময় ও ব্যঙ্গপ্রিয় ভদ্রলোকের কথায় যত না হোক,—হাব-ভাবে ও বলবার কায়দায় হাসিয়া উঠিলাম। আবার তাতেও বিপদ—ভদ্রলোকের খোঁচা খেয়ে আমি অস্থির হয়ে পড়লুম। আমাকে হাসতে দেখেই তিনি বলে উঠলেন "বাঃ, কেয়াবাৎ, সতীশ বাবুর রসবোধ ও তাল জ্ঞান বেশ টন্‌টনে'। কখন হাসতে

হয়—কখন কাঁদতে হয়—তা তো বেশ সাধা আছে দেখছি। আহা—প্রাণখানি যেন সর্ব্বদা শরৎকালের মেঘ ও রৌদ্রের খেলা খেলতে ব্যস্ত। যাক্, সে সব কথা চুলোয় যাক্, এখন খেয়ে একটু সুস্থ হ'ন্ দেখি, আর চোক মুখটাও ফুলিয়ে নিন্, নইলে শুকনো মুখ নিয়ে রাধিকার কাছে আপনার যাওয়া হবে না। এতেই দশবার জিজ্ঞাসা করবে—সতীশদা'কে রাস্তায় ভাল করে' খাওয়ান হয়েছে তো? কে মশায় পরের কাছে এত কৈফিয়ৎ দেয়? যাক, মশায়,—আপনি এবার সশরীরে চললেন একটা কিছু হেস্ত-নেস্ত করে দেবেন। পরস্ত্রী পরপুরুষের ব্যথায়—ব্যথায় ও নয়—ব্যথার আশঙ্কায় এত উতলা হয় কেন? না, না, এ ভাল নয়। এ মোটেই কেউ পছন্দ করে না। সতীশ বাবুর অভিমতটা কি?" ভদ্রলোক নেহাৎ না—ছোড়বান্দা, আমার একটা জবাব না নিয়ে কিছুতেই ক্ষান্ত হবেন না, অথচ দিতেও হ'বে—তাও আমার ভেবে চিন্তে! তা ছাই তাইতেই কি এড়ান্ আছে? এগুলেও 'নির্ব্বংশের ব্যাটা' পিছুলেও তাই; কিন্তু এমন তব আমার অবস্থা দাঁড়িয়েছে, যে হয় আগাও—নয় পাছু হাটতেই হবে, চুপ্ করে থাক্‌বার উপায়টি নাই। বারম্বার যখন আমায় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন 'সতীশ বাবুর কি অভিমত'—তখন একটা অভিমত

আমাকে প্রকাশ করতেই হোল। আমি বললুম "যে, না,—আপনি কি Sense এ বলছেন—" মেধাবী আগন্তুক বাধা দিয়া বলিলেন "তা জানি সতীশ বাবু, পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গতে সকলেই পছন্দ করে, অতএব আপনার সময়ে এ পদ্ধতির ব্যতিক্রম ঘটা অসম্ভব, তাইতে আবার আপনারও জ্বালা আদৌ নেই। আপনি স্ত্রীলোকের এ ভাবটাকে প্রশংসা করবেন এ তো জানা কথা।" ভদ্রলোকের এই অপ্রিয় তামাসায় মনে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করলুম। ভাবলুম লোকটা বড়ই অসভ্য ও অশিক্ষিত। শ্রীরামপুর ষ্টেশনের কাছে এসে এই মেধাবী আগন্তুকের নাম ও পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁর নাম অবলা বাড়ুজ্যে, হাইকোর্টের জনৈক এটর্ণি (Attorney at-Law), আমার 'অশিক্ষিত—' এই অনুমান মিথ্যায় পরিণত হলো। অবশ্য মনে একটু ক্ষুণ্ণ হলুম; কিন্তু অপর অনুমানটি যে ধ্রুব-সত্য এই ভাবিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলুম; বিশ্ববিদ্যালয়ের কষ্ঠি-পাথরে সোণা বলে উত্তীর্ণ হ'তে পারে—কিন্তু সংসার ও সমাজের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে খাঁটি বজায় রাখা বড়ই কঠিন। এরূপ অনেক সোণা—পিতল ও কাঁসায় দাড়িয়েছে। যা'ক, নিজের মত বলবৎ রাখবার জন্য এই দুঃসময়েও অপ্রাসঙ্গিক সমালোচনায়

মন দিতে হয়েছিল। হায় মানব, জেদ বজায় বুঝি তোমার প্রধান ধর্ম্ম।

অবলা বাবু এটর্ণি শুনে মনটা বিশেষ দমে গেল; কেন না কোনো এটর্ণি-মহাপ্রভুই রাধিকা-ধনের অধিকারী হয়েছিলেন; তবে তিনি এই অবলা বাঁড়ুজ্যে—না আর কোনো ভাগ্যবান্—তা' জানবার সুযোগ ও সুবিধা আমার ভাগ্যে হয়ে উঠে নাই; কারণ যে দিন শুনলুম যে রাধিকার সঙ্গে আমার বিবাহ অসম্ভব, যেহেতু আমি রাধিকার অপেক্ষা বয়সে দুইমাসের ছোট—এই গুরুতর অসহনীয় অপরাধ, সেই দিন হ'তেই রাধিকার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু প্রাণের শত আকুলি ব্যাকুলি সমস্তই উপেক্ষা করতে আরম্ভ করেছিলুম, এবং খোঁজ খবরের সকল পথ জোর করে বন্ধ করে দিয়েছিলুম। কেন করেছিলুম বলবো? কিছুখানা বলে' প্রাণটা হাল্‌কা করবো, নইলে আর পারছি না—ক্ষমতায় আর কুলিয়ে উঠছে না। ছেলেবেলা হ'তে আমি বড় 'একগুঁয়ে' তাই এতদিন আপনাকে সাম্‌লাতে পেরেছিলুম; কিন্তু আজ আর পারি না। কূল ছাপিয়ে মত্ত-তুফান আপনার ভাবেই প্রমত্ত ছিল; কিন্তু কোথা হ'তে বিশ্বাসঘাতক,—পরশ্রীকাতর পাগল বাতাস এসে এমন ঢেউ তুলে দিলে,—যে তার ঘাতপ্রতিঘাতে

কিনারা বেচারী শশব্যস্ত হয়ে উঠলো। কিনারার প্রাণ কতক্ষণ সহ্য করবে? আঘাতে ক্ষতবিক্ষত গলিত হ'য়ে নিজের অস্তিত্ব হারা হবে,—না হয় ভাঙ্গা বুক আরও দৃঢ় করতে হবে—কিম্বা দূরে ছুটে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে হবে। এই তিনটি পথের একটি অবশ্যই অবলম্বনীয়। নিজ অস্তিত্ব লুপ্ত করতে তো কেউ চায় না, কারও চাওয়া স্বভাবও নয়। তবে বুক শক্ত করা আবশ্যক, কিন্তু আবশ্যক বললেই তো আর আবশ্যকতা রক্ষিত হয় না; (additional) বাইরের শক্তি চায়, কিন্তু শক্তি চাইলেই পাওয়া যায় না; কাজেই তৃতীয় পন্থা ব্যতীত আর উপায় নাই। অতএব অস্তিত্ব বজায় রাখতে হ'লেই কিনারার দূরে দূরে পলায়ন ব্যতীত আর কি পথ থাকতে পারে? আমিও তাই সহ্য করা যতদূর সম্ভব করেছি; কিন্তু আর পারছি না। হয় সাহায্যকারী শক্তির আবশ্যক—নয় বহুদিনের সুপরিচিত স্থানটি ছেড়ে দূরে পলায়ন অবশ্য-কর্ত্তব্য, নইলে যে অস্তিত্ব চিরতরে লুপ্ত হবে। শক্তি কে দেবে?—যে দেবে সে তো দিতে চাইবে না, পারবে না, দেবেও না; কাজেই 'দূরমপসর' ব্যতীত পথ নাই। দূরে সরে যাওয়া মানেই বুক খালি করে দেওয়া—আঘাতের নিদারুণ ঘা না খাওয়া; তাই আজ ক্ষত বুক খালি করবো—নয় আর পারছি

না, অস্তিত্ব রাখতে আর পারছি না। মর্ম্মে শেল গাঁথার মত দুঃসহনীয় অতীতের স্মৃতি আজ একবার মাত্র জাগিয়ে তুলবো। মনের কথা মনে রাখলে বড় যন্ত্রণা হয় তাই আজ মুখ ফুটে বলবো। যার হৃদয় আছে তাকেই শোনাবো—হয়তো বা নীরবে সে সহানুভূতি দেখাবে—আমি তাই করবো, ওগো আমি তাই করবো।

রাধিকা ও আমার বাপ কল্‌কাতায় একসঙ্গে দুইজনে পাটের দালালি করতেন—আয়-ব্যয় যা কিছু সবই একসঙ্গে হোত। তাঁদের প্রথম হ'তেই ইচ্ছা ছিল যে, দিন পাইলেই উভয়ে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া প্রণয়-রজ্জুটা খুব শক্ত করে নেবেন। সামাজিক কিম্বা মানসিক কোন বাধার কথাই তখন তাঁদের মনে আসে নাই; কারণ রাধিকার বাপ মুখুজ্যে আমরা বাড়ুজ্যে—পাল্টাঘর, মনেরও বিশেষ সদ্ভাব, কার্য্যেরও খুব সুবিধা। এসব যখন কথা—তখন আমিই বা কোথায় আর রাধিকাই বা কোথায়। কিন্তু দেখতে দেখতে এমন দিন এল—যখন রাধিকা ও আমি দুই মাস মাত্র আগু-পিছু হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলাম। পিতৃ-পুরুষের মন এইরূপ অসামঞ্জস্য ব্যাপার দর্শনে বড়ই ব্যথিত হইল,—হইবারই কথা। মানুষ যখন কায়মনোবাক্যে সুবিচার

প্রার্থনা করে—তখন সুবিচার যদি না পায়, তা'হ'লে মনের অবস্থা যদ্রূপ হয়—মুখুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে মহাশয়েরও এক্ষেত্রে তাহাই হইল। ততোধিক ক্ষুব্ধ হইলেন জননীদ্বয়; কিন্তু এ বিচার যিনি করেছেন তাঁর উপরিওয়ালা কারও জানা নাই, কাজেই নীরবে সহ্য করা ব্যতীত আর উপায়ান্তর কি। তবু নাকি শুনতে পাওয়া যায় এরূপ অদম্য সাহস ও ইচ্ছা তাঁদের ছিল,—যে পুরাতন মতে বিবাহ দিতে না পারলেও আধুনিক মতে আমাদের বিবাহ দিবেন এটা একরকম ঠিক করেই রেখেছিলেন।

আমরা (রাধিকা ও আমি) এক সঙ্গে একভাবে, এক খাদ্যে, এক শয্যায়, এক পোষাকে সমান আদর যত্নে দিন দিন শশিকলার মত বাড়তে লাগলুম। একদিন—মনে পড়ে তখন আমার বয়স সবে দশ বছর, সেই সময়ে দুরন্ত বিসূচিকার আক্রমণে বাড়ুজ্যে মশায় ও মুখুজ্যে মশায় পাঁচ ছয় ঘণ্টা আগু-পিছু পরলোকে গমন করেন। রাধিকা ও আমি বাড়ীর আর সকলেরই মত অনর্গল অশ্রুপাত করেছিলুম। আরও মনে আছে—আমাদের সমসাময়িক প্রতিজ্ঞা। তখন আমরা যদিও নেহাৎ ছেলেমানুষ, সংসারের সকল বিষয়েই সমান অনভিজ্ঞ, তথাপি পিতৃপুরুষদের ঐকান্তিক

ইচ্ছা যেন আমাদের মুখ হ'তে বের করে দিলে যে আমরা আমাদের বাপের অভিলাষ পূরণ করবো।

পাটের কার্য্যে আমাদের পিতৃদ্বয় অনেক টাকা রোজগার করেছিলেন, এবং "দান-ধ্যান" ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সমাপনান্তেও আমাদের জন্য অনেক টাকা রেখে যেতেও পেরেছিলেন। অর্থ-স্বাচ্ছল্য হেতু সংসারে কোন কষ্টই আমাদের কোন দিন ভোগ করতে হয় নাই। কোন ঝঞ্ঝাটই ছিল না,—শুধু বসে, বসে, খেতে পারলেই হোল।

* * * * * *

তারপর অনেক দিন অতিবাহিত হয়েছে। আমি সেবার বি, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত—আমার মায়ের আর আনন্দ ধরে না; কিন্তু আনন্দের সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করবার আগেই ভগবানের রাজ্যে যাবার ডাক পড়লো। তিনিও সমস্ত ভুলে আনন্দ নিরানন্দ পিছনে রেখে সাঁঝের আঁধারে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন। সংসারে তখন আমি একা—কূল-কিনারা কিছুই জানি না, ভাল-মন্দও বিশেষ কিছুই বুঝিনা—বুঝতুম শুধু রাধিকা, সেক্সপীয়রের গুহাবাসিনী সৌন্দর্য্যের রাণী মিরাণ্ডা, বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশনন্দিনী আর কালীদাসের শকুন্তলা। কিন্তু খেয়ালের ঝোঁক

শীঘ্র শীঘ্রই কেটে গেল। সংসার একে একে তার জটিল কুটিল ভাল মন্দ সমস্ত সমস্যা আমাকে জোর করে বোঝাতে লাগলো—কেমন মজা, আমিও অল্পে অল্পে সকলগুলিই বুঝতে লাগলুম।

আমাদের কলিকাতার সংসারে তখন শুধু আমি, রাধিকা, রাধিকার মা ও এক মাতুল। রাধিকা তখন আঠার বছরের মেয়ে, তখনও অনূঢ়া। সামাজিক হিন্দুর ঘর, আর তো আই-বুড়ো রাখা যায় না। এতেই তো কতদোষ করে ফেলা হয়েছে, অধস্তন সপ্তম পুরুষদের নরকে টেনে আনা হয়েছে, সমাজের ঘাড় হেট করে দেওয়া হয়েছে, ঘোর সংসারীর কুৎসা রটাবার কি সুন্দর উপাদান প্রস্তুত করা হয়েছে, কিন্তু যাই হোক, আরতো চলে না। একটা কিছু করতেই হ'বে। রাধিকার মা বড় বিপদে পড়লেন; কিন্তু সে বিপদ বেশীক্ষণ স্থায়ী হোল না, কারণ 'বিপদভঞ্জন মাতুল শ্রীগোবিন্দ' বর্ত্তমানে বিপদ কতক্ষণ থাকতে পারে। কতক শুধু ভাই-বোন বিদিত,—কতক সর্ব্বজন বিদিত পরামর্শ ঠিক হয়ে গেল।

রাধিকা আমার চেয়ে দুই মাসের বড় হলেও আমার স্বর্গগত পিতার শিক্ষায় আমাকে 'সতীশ দাদা' বলেই ডাকতো, কারণ পিতাঠাকুর বলতেন যে স্ত্রীলোকের পুরুষ মানুষের নাম ধরে ডাকা

শোভা পায় না। কাজেই এক অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক—পুরুষ বলে' এক অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকার—যদিও সে প্রকৃত পক্ষে বয়সে বড়—দাদা হ'য়ে দাঁড়ালেন। শেষে দাদার 'দা' অক্ষরটা উড়ে গিয়ে সতীশদা' হয়ে উঠ্লেন—আর এতদিন পর শুনতে পেলুম সেই 'দা' দিয়েই সতীশচন্দ্রের যা কিছু ছিল সব কেটে-কুটে সাফ করে ফেলা হোল।

* * * * * * *

গয়ংগচ্ছ করতে করতেই আর এক বছরও কেটে গেল। সেদিনও এমনি সকাল বেলা,—এই সকাল বেলাই আমার জীবনের ঘনঘটাচ্ছন্ন কাল,—রাধিকা সহসা ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হলেন! ধূমকেতু বল্ছি তার কারণ রাধিকার সঙ্গে আজ কাল আর আমার দেখা শুনা একরূপ হোতনা বল্লেও চলে। রাধিকা আসিয়া আমায় দিব্য সহজ সরলভাবে জানাইলেন যে তাঁর বিবাহের জন্য পাত্র ঠিক্, অতএব আমার এস্থান পরিত্যাগ্ অবশ্য-কর্ত্তব্য এবং সেটা যত শীঘ্র হয় তাহাই বাঞ্ছনীয়। রাধিকার এই কথায় আমি ভাবিলাম—যে এ কি রমণী না মায়াবিনী! এই কি কবির বর্ণনার কোমল-কলিকা! কবি, তুমি চিরদিনই উন্মাদ তাই অসঙ্গত নাম দিতে তোমার বাধেনা।

কবি, তোমার প্রলাপ-বচনে কেন মানুষের মনে কুসংস্কার জাগিয়ে দাও, এই কি তোমার উচিত—না কর্ত্তব্য ! তুমি তো উন্মাদ, তোমার আবার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, উচিত অনুচিত কি ? সে যাই হোক্, তুমি যাই বল—আমি বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছি, যে স্ত্রী-জাতি কোমল-কলিকা নয়—সে দৃঢ় প্রস্তরের ফলক্, তার সংস্পর্শে হৃদয় শুধু ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়। সে অবলা নয় সবলা, সুধা নয় বিষ, সুন্দর নয় কুৎসিত সহজ নয় বাঁকা। এতগুণ যদি তার থাক্‌তো, এত ভাল যদি সে হোত, তবে কি সংসারে তার স্থান এত নীচে হয়, সে এত ছোট, এত ঘৃণ্য, এত মুখাপেক্ষী হয়? কবি, তোমার কল্পনার চক্ষে সে যা হয় হোক্, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে বড় বীভৎস, বড় কপট, অতি বড় চতুর। নারীকে দুর্ব্বল বল কবি কেমন করে জানি না, কিন্তু এত বল যে আর কেউ ধরে, প্রলয় ঘটাতে যে আর কেউ পারে—তা তো আমার জানা নাই। তোমায় দোষারোপ করি না কবি, কারণ অসত্যকে সত্য করা, কুৎসিতকে সুন্দর করা, ছায়াকে কায়াময় করা, এক কথায় হয়কে নয় করা, তোমার চিরস্বভাব ও অবশ্য-কর্ত্তব্য। কবি, তুমি তোমার নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে স্বপনের খেয়ালে, নিদ্রা-জাগরণের মাঝখানে, আকাশ-পাতালের মিলন-গানে বিভোর থাক,—

মিনতি—শুধু আমাকে রেহাই দাও। আমাকে নারীর স্বরূপ বুঝ্‌তে দাও। তোমার বাণীর প্রতিধ্বনি আমার কাণে তুলে আমায় কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন করো না।

পূর্ব্বেই বলেছি যে আমি বড় একগুঁয়ে। যেমন শুনলুম্‌ রাধিকা আমার হ'বে না, হওয়া সম্ভবপর নয়, সমাজ বাধা দেয়, লোকচক্ষু বিদ্রূপের হাসিরাশি ছড়ায়, আর রাধিকাও অসম্মত, তখনই—সেই দণ্ডে আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করে নিলুম। অতি প্রশান্তভাবে রাধিকাকে বলেছিলুম্‌ "রাধিকা তুমি সুখী হও, চিরায়ুষ্মতী হও, স্বামীর চির আদরের ধন হ'য়ে থাক।" বাস্‌, এই আমার শেষ কথা—কথাগুলি বল্‌তে আমার বক্ষ কেঁপে উঠেছিল সহস্র বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা আমায় বিষম যাতনা দিয়েছিল, চোখ-মুখ লাল হ'য়েছিল, কিন্তু আমার দুর্ব্বার মাথাখাড়া-রাখা-স্বভাব আমায় কর্ত্তব্য পথে চালিত ক'রবার শক্তি সংযোজনা কর্‌তে বিস্মৃত হয় নাই।

* * * * * * *

তারপর আরও দুইবৎসর অতীত হ'য়েছে। রাধিকা কোনো এটর্ণীর স্ত্রী হ'য়েছে, আমিও আমার টাকা-কড়ি যা কিছু ছিল নিয়ে কল্‌কাতার আকাশ-বাতাসের বাইরে সুদূর মফঃস্বলে একা-

লতী কার্য্যে ব্যাপৃত হ'য়েছিলুম। চিরদিন,—ছেলেবেলা হ'তেই কল্‌কাতার উচ্চ আদালতের উকীল হব এই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে ইচ্ছা দমন করবার ক্ষমতা ও ভগবান আমায় দিয়েছিলেন ; তাই কল্‌কাতা পরিত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই রাধিকাকে ওরূপ জবাবদিহি করতে পেরেছিলুম্‌ অতি অল্প সময়ে ও আয়াসে রাধিকাদের, সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতেও সক্ষম হয়েছিলুম্‌। আর সেই বলে রাধিকার স্মৃতি বিস্মৃত হ'য়ে কর্ত্তব্য-কর্ম্মে মন দিতে পেরে-ছিলুম্‌। এতদিন পরে আমার ওই একরোখা স্বভাব, যে আমার এত বড় একটা উপকার সাধন করতে পারলে, এই আমার পরম তৃপ্তি—চরম লাভ।

কিন্তু আজ,—ওগো, আজ যে আমার সমস্ত দম্ভ ভেঙ্গে গেছে। গর্ব্বিত স্বভাব—আমার পাণ্ডিত্য, আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান, আমার তৃপ্তি শান্তি সব যে ধুয়ে মুছে গেছে। আমায় পাগল করেছে ; রাধিকার পত্র, তার পুরাতন স্মৃতি, আর সেই পরিচিত মুখ, আমার অনন্ত রুদ্ধ বাসনা জাগিয়ে আজ আমায় পাগল করেছে। তাই ঘরদোর, মোকদ্দমা মক্কেল, আদালত, মফঃস্বল, খাতাপত্র, টাকা-কড়ি সব ছেড়ে শুধু পাঁচটি ছত্রে লেখা একখানি পত্রের—না, না পত্রের নয়, লেখিকার আহ্বানের—না, না তাও নয়,

প্রাণের তাড়নায় আজ আগন্তুকদের সঙ্গে কল্‌কাতা আস্‌বার জন্য ট্রেনে উঠেছি। হয়, হয় এমনই হয়। যার হয় সে জানে—আর ভগবান জানেন।

* * * * * * *

কল্‌কাতা এসেছি, রাধিকাকেও দেখেছি। আর 'সতীশদা' ডাক শুনে বিহ্বল হয়ে পড়েছি, আগন্তুকদের পরিচয়ও পেয়েছি, আর সব চেয়ে খুসী হয়েছি অবলা বাবু—উপযুক্ত স্ত্রীর উপযুক্ত স্বামী—তাঁর আমায়িক প্রাণ-ঢালা সরল ব্যবহারে। একদিন অবলা বাবুর শুইবার ঘরে একখানি চেয়ারে বসিয়া একখানি Law Journal এর পাতা অন্যমনস্কভাবে উল্টাইতেছি, এমন সময় রাধিকা তার ননদিনী—অবলা বাবুর ভগিনী—বিদুষী ও সুন্দরী মনোরমার সহিত আমার বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপিত কর্‌লেন। বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে রাধিকার পানে চাইলুম্, তবু তার করুণা জাগ্‌লোনা, তবু সে আমার মন বুঝ্‌লে না। বিস্ময়াভিভূত আমি নির্ব্বাক হ'য়ে রইলুম্। কাণে গেল "সতীশদা, আমার কথা রাখ্‌বে না, রাখ্‌বে না, রাখ্‌বে না?" দেখিলাম কুরঙ্গ-নয়না রাধিকার আঁখি দুটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। তার আবেগভরা "সতীশদা আমার কথা রাখ্‌বে না"—এর প্রতিবাদ

করা আমার পক্ষে সুকঠিন হইল, আমি কোনো কথাই বলিতে পারিলাম না। 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' ধরিয়া অবলা বাবু তাঁহার সহজ-সরল হাসিতে ঘরখানি মাতাইয়া বলিলেন "কি সতীশ বাবু, 'প্রস্তুত কি না'?" আবার সেই প্রস্তুতের কথায় আমার অপ্রস্তুতের কাহিনী মনে পড়িল, আমিও হাসিয়া ফেলিলাম। কিন্তু উত্তর দিল রাধিকা "হাঁ, সতীশদা প্রস্তুত।" চিরকালের একগুঁয়ে আমি আমার এই অদৃষ্ট-ফেরে কিন্তু 'না' বলিতে পারিলাম না।

২

বিধির বিধান

আমি একজন ঘর-জামাই। যে ঘরের আমি জামাই—সেই ঘরে আমার মত আরও দুইটি প্রাণী ছিলেন এবং তাঁহারাও আমারই মত ঘর-জামাই। অগাধ-সম্পত্তি, বিপুল-অর্থ, সুন্দর অট্টালিকা মনোহর-উদ্যান, বহু দাস-দাসীর সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেও শ্বশুরের ঐ কি একরকম স্বভাব মেয়েগুলিকে বাড়ীতেই রাখা। কোনো বন্ধু-বান্ধব কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হাসিয়া বলিতেন "ওহে তোমরা তো বোঝ না, এ কন্যা দিয়ে পুত্র লাভ। এর নাম ভগবানের উপরেও এক চাল' চালা। তিনি অভাব অভিযোগ দিয়েছেন—সঙ্গে সঙ্গে বিবেক ও বুদ্ধি দিয়েছেন, কাজেই এগুলিকে তো রীতিমত খাটিয়ে নিতে হ'বে। বুঝেছ—বুদ্ধি-বিবেকগুলিকে তো বসে' বসে' খাবার জন্য তৈয়ারী করেন নাই।" হয়তো এই ব্যাপারে অনেকেই মদীয় শ্বশুর মহাশয়ের সন্তান-বাৎসল্যের পরম পরাকাষ্ঠা প্রমাণ করিতে উৎসুক হইবেন এবং প্রগাঢ় অপত্যস্নেহ লক্ষ্য করিবেন, কিন্তু আমি তাঁহার গৃহে আট বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছি এবং তদ্দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ

করিয়াছি, তাহার উপর ভর করিয়া নিশ্চয়ই বলিতে পারি—যে আদার্শ স্নেহ মায়া মমতা ইত্যাদির কোনো লক্ষণই কখনও তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইত না। পোষ্যদিগের প্রতি অবশ্যকর্ত্তব্য যাহা—তাহার উপর আর অধিক কিছু করিতে তাঁহাকে আমি তো কখনও দেখি নাই। তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান সকল সময়ে মাথা খাড়া রাখিয়া—তাঁহাকে কার্য্যে প্রবৃত্তি, অপত্যস্নেহে বাধা, সংসারের কাজে বুদ্ধি প্রদান করিত;—তাই তিনি সকল সময়েই নিজের সৃষ্ট একটি গণ্ডির মধ্যে সকল জিনিষকেই আবদ্ধ রাখিতেন। আমার মনে হইত স্নেহ বুঝি শ্বশুর মহাশয়ের নিকট কর্ত্তব্যের অপর নাম বলিয়া পরিগণিত ও পরিচিত ছিল। যথা, কোনো কন্যার ব্যয়রাম হইয়াছে জানিলে ডাক্তার কবিরাজ ঔষধ কিম্বা পথ্যের কোনো অভাব হইত না; তবে যে টুকু অভাব ছিল—সে টুকু শুধু তাহার খোঁজ-খবরের। এই খোঁজ-খবর লওয়া তিনি নাকি পছন্দ করিতেন না এবং পছন্দ করা যে উচিত—তাহাও মনে করিতেন না। ধনবান্, ক্ষমতাবান্, কাজেই প্রতিভাবান্ তিনি—অতএব কাহারও সাধ্য ছিল না, যে তাঁর উচিত অনুচিত জ্ঞানের সমালোচনা করে; সুতরাং বেমানান্ হইলেও অর্থবলে সব মানান-সই হইয়া যাইত। এইস্থানে একটা কথা বলিয়া রাখা উচিত,—যে কেবল একমাত্র আমিই—তাঁহার

সু-নজরে পড়িয়াছিলাম্—যাহার জন্য তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন যাহাকে তিনি চোখে চোখে রাখিয়াও সুখী হইতেন না, যাহার সুখ-অসুখে তিনি বিচলিত হইতেন, যাহাকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন এবং যাহার কথায় তিনি অসাধ্য সাধন করিতেন। আমার বরাত-জোর খুব—অবশ্য স্বীকার্য্য। প্রথমতঃ দরিদ্রের সন্তান আমি ভাগ্যবশে আজ পুত্রহীন লক্ষপতির জামাতা, তারপর যে শ্বশুরের আদর কেউ কখনও পায়নি, আমি তাঁর সব আদর টুকু 'একচেটে' করিয়া লইয়াছিলাম। এ আমার জোর-বরাত নয় তো কি? অনেকেই আমার এই সৌভাগ্য লাভে নাক্ সিঁট্‌কাইবেন ও ব্যঙ্গোক্তি প্রকাশ করিবেন তাহা জানি, তথাপি তাঁহারাই এই সৌভাগ্য পাইলে যে হেলায় হারাইবেন না, তাহাও জানি। কাজেই ও সকল কথা আমি ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনি না। আর আমার অবস্থায় পতিত হইলে কেহ যে ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিতে চাহিবেন না—তাহাও ধ্রুব সত্য।

যা'ক, আমিই বড় জামাই; জ্ঞানে, বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ না হইলেও শ্রেষ্ঠের আসন আমার অধিকারেই ছিল। আর দুইজনকে অবশ্য তারা আমার মুখাপেক্ষী না হইলেও অনেক বিষয়ে আমার মতামতের উপর নির্ভর করিতে হইত। ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষায় কৃতকার্য্য

হইবার পরেই মদীয় শ্বশুর মহাশয় তাঁহার সহকারীরূপে আমায় গ্রহণ করেন ও বৈষয়িক-ব্যাপারে লিপ্ত করান। সেই অবধি আমি বিষয় লইয়া ব্যস্ত ছিলাম। বিশেষ কোনো কাজ যে করিতাম তাহা নয় অথচ বিশেষ অবসরও আমার ছিল না! জগতে এই বড় আশ্চর্য্য—যাহার যত কাজ বেশী, সময়ও তাহার তত বেশী; আবার যাহার আদৌ কাজ নাই তাহার সময়ও নাই। শেষোক্তটিই আমার পক্ষে খাটিত ভাল। কোনরূপ কার্য্যাদি না করিলেও আমি যে সমস্ত কাজ বুঝি ও জানি—তাহা সকলেই স্বীকার করিত। কেন করিত তাহা জানি না—তবে প্রচার ঐরূপ!

অন্য দুইজন জামাতার মধ্যে—দ্বিতীয় জামাতা—বার বার তিনবার আই, এ, (I.A.) পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া শ্বশুরালয়ে পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে,- পরীক্ষায় কৃত-কার্য্য হওয়াই যে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য নয়' ইহা সপ্রমাণ করিতে নানারূপ নজির হাজির করিতে কোনো দিনের জন্য কোনোরূপ ত্রুটী করিত না। আরও বিশেষত্ব তার এই—যে সর্ব্বদাই পরের দোষ অনুসন্ধান করিয়া তাহার যথা ও অযথা সমালোচনা সে করিত। আর তৃতীয়টি যৎসামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করিবার পরে অজীর্ণ-

রোগে কিয়দ্দিনযাবৎ ভুগিয়া বিদ্যাশিক্ষার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল। শ্বশুর মহাশয়ের অবিশ্রান্ত ব্যয়, ডাক্তার কবিরাজের নিয়মিত চিকিৎসা, আত্মীয় ও দাসদাসীগণের একটানা শুশ্রূষা, বায়ু-পরিবর্ত্তনের সবিশেষ ঘটা—ব্যাধির কিছুই উপশম করিতে পারে নাই! কিন্তু যেদিন হইতে লেখাপড়া পরিত্যাগের ব্যবস্থা হইল, সেইদিন হইতেই সমস্ত ব্যাধি একেবারে নির্ব্যাধি হইয়া গেল। সে আজকাল নিরোগী ও স্বাস্থ্যবান্ হইয়া দিবরাত্র গান-বাজনা চর্চ্চা আমোদপ্রমোদ লইয়া মত্ত ছিল। ছোট জামাই-বাবু 'নবিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা' সার বুঝিয়া সঙ্গীত চর্চ্চায় ব্যস্ত থাকিতেন। এই তো গেল আমরা জামাই বাবুর দল—আমাদের পরিচয়।

শ্বশুর মহাশয়ের তিন-কন্যা—তিনি অপুত্রক্ ও বিপত্নীক্। প্রথমা-কন্যা সরলাবালা চিরকালের অভিমানিনী, দ্বিতীয়া চপলাবালা পিতার আদরে আদরিণী, তৃতীয়া অমলাবালা সদাই গরবিণী। তিন ভগিনী তিন রকমের, আমারা তিন জামাই তিন রকমের। হইবারই কথা, কারণ লোকেই বলে হাতের পাঁচটি আঙ্গুল তো সমান হয় না। বলা বাহুল্য শ্বশুর-ভবনে আসিয়া আমিই চপলা ও অমলাকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি। আমারই হাতযশে একজন আদরিণী—অন্য জন গরবিণী। জোর বরাত আমার—তাহার আর কোনো ভুল নাই।

যা'ক, সুখের দিন সুখেই কাটিতেছিল। দিব্য নিশ্চিন্তমনে নির্ব্বিকার চিত্তে আহার ও নিদ্রায় কালাতিপাত করিতেছিলাম; কিন্তু সংসারে একটানা সুখের কোলে মাথা রাখিবার অদৃষ্ট মানুষের তো হয় নাই। পরান্নপ্রিয়, ভবিষ্যৎ-জ্ঞানহীন আমরা তিনটি সুখের প্রাণী—আমাদেরও দুঃখের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সহসা একদিন প্রাতঃকালে শ্বশুর মহাশয়ের সন্ন্যাস-রোগে ভবলীলা সাঙ্গ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও সুখের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। এতদিন শ্বশুর মহাশয় বর্ত্তমানে ও তাঁহার অর্থবলে আমাদের কোনো ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই সত্য; কিন্তু পুরুষ-চরিত্র ও অর্থ যে টুকু কষ্ট দূরীভূত করিতে সমর্থ হয় না সে টুকু কষ্ট অবশ্যম্ভাবীরূপে আমাদের প্রায়ই সহ্য করিতে হইত। মাতার স্নেহে চিরবঞ্চিত হইয়া, মায়ের আদর যত্ন ও আবেগের বাহিরে থাকিয়া আমাদের মন বড়ই অপ্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জননীর স্নেহ-ছায়ায় বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ ও সুবিধা আমাদের ঘটিয়া উঠে নাই, সেই জন্যই বিশ্বস্ততা এবং উদারতা শিক্ষার অবকাশ আমরা পাই নাই,—কাজেই আমরা একরকম সৃষ্টিছাড়া জীব হইয়া উঠিয়াছিলাম।

শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই আমরা তিনজন—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে—বিবাদ-বিসম্বাদ পূর্ণমাত্রায় আরম্ভ হইল। কারণে অকারণে কুচক্রী-বিষ্ণু আজকাল প্রতি পদে আমার ও আমাদের সকলের সকল কার্য্যেই ক্রটী ধরিয়া প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। বিবাদকারী আমরা সকলেই স্ব স্ব হস্তে পূর্ণ সাড়ে তিন হাত, কেহ একচুলও কম বেশী নয়, কাহারও মধ্যে কোনোরূপ ইতর বিশেষ নাই; সুতরাং বিবাদ-বিসম্বাদের মেঘ দিন দিন ঘনীভূত হইতে লাগিল। সমান অংশের মালিক—জামাই বাবুদের বিবাদভঞ্জন করিবে এরূপ লোক সংসারে বিরল। আমি ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, অর্থাৎ বিষয়-আশয় যা কিছু সমস্তই আমার সুবিদিত, সেই জন্য আক্রোশটা আমারই উপর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। পাগল ভোলা এসবের খোঁজ খবর রাখিত না, ধারও ধারিত না। আমার শালীপতি-ভাই শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র (গতায়ু শ্বশুর মহাশয়ের ২য় জামাতা) আমার উপর দোষারোপ করিবার সুবিধা পাইলে—কখনই সে সুবিধা পরিত্যাগ করিত না। কিন্তু এতকাল কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহার কারণ সিংহরাশি পুরুষ—আমার শ্বশুর মহাশয় জীবিত ছিলেন, আর আমিই সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার আদরের জামাতা বল, পুত্র তুল্য প্রিয় বল, দক্ষিণ হস্ত বল, যাহা কিছু সব আমিই ছিলাম। তখন আমার

মাথায় ছাতি ছিল—তাই রৌদ্রতাপে তাপিত হইতাম না, বৃষ্টির ছাটে সিক্ত হইতাম না, কিন্তু মন্দভাগ্য আমি—আজ আমার ছাতি পুড়িয়া ছারখার হইয়া মাটিতে মিশিয়াছে; কাজেই সূর্য্যের কিরণ, বৃষ্টির জল—আমার শূন্য মস্তক বহিয়া সর্ব্বাঙ্গ তাপিত ও মলিন করিয়া তুলিয়াছে, দুশ্চিন্তার বক্ররেখা আমার কপালে পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছে।

একদিন আমাদের দ্বিতল গৃহের বারান্দায় চপলাবালার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময়ে শরৎচন্দ্র সেই স্থানে উদিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গেই রাহুগ্রস্ত হইলেন! সুবিমল শুভ্র শরৎ-চন্দ্রের জ্যোতিঃ ক্ষণেকের মধ্যে মলিনতা ও কুটিলতায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। শরৎচন্দ্র বীর হুঙ্কারে স্বীয় পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "ফের্।" চপলা, চপলার মতই ক্ষণিকের হাসি হাসিয়া—অন্ধকার ছড়াইয়া—অসংলগ্ন ঘোমটার কাপড় যথাযথ সংলগ্ন করিল এবং পর মূহূর্ত্তেই—বারান্দা বহিয়া দরদালানে প্রবেশ করিল। মেঘ গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া যেমন বিদ্যুৎরাণীর পশ্চাৎ ধাবন করে, শরৎচন্দ্রও সেইরূপ বীরপদভরে মেজেখানি কম্পিত করিয়া সবেগে চপলার অনুসরণ করিল। ব্যাপার সম্যক্ নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না, তথাপি সশঙ্কিত-চিত্তে, ভয়-ব্যাকুল-হৃদয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ

করিতে লাগিলাম। পরক্ষণেই দেখিলাম শরৎচন্দ্র স্বীয় শয়নকক্ষে চপলাকে লইয়া গিয়া ভিতর হইতে সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কৌতূহল ও আবেগের বশবর্ত্তী আমি—ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া দরজার বাহিরে কাণ পাতিলাম। স্বামী-স্ত্রীর সকল কথাগুলি আমার কর্ণগোচর না হইলেও চপলার এই কথাগুলি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। চপলা বলিল "আমি জামাই বাবুর সঙ্গে না হয় আর কথা কহিব না, কিন্তু তুমি কই কথা বন্ধ করতেও তো বল নি।" শরৎ সজোরে বলিল "নিশ্চয় বলেছি, আবার আজও বলছি; কিন্তু তুমি তো সে কথা শুনতে পারে না শুনবেও না!" চপলা অতি ধীর ও প্রশান্তভাবে বলিল "বেশ আর কথা কইব না; কিন্তু একটা কথা তোমায় বলতে হ'বে তুমি এ অন্যায় সন্দেহ কেন কর?" "সন্দেহ কেন করি! তুমি যুবতী পরস্ত্রী—কোন্ সাহসে একজন যুবকের সহিত হাসিয়া নির্জ্জনে কথা বার্ত্তা কইতে পার?" এই কথাগুলি শরৎচন্দ্র মেঘমন্দ্র গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল। চপলা বিনয়-নম্র সহজ-সরল ভাবে উত্তর দিল "সে কি গো! জামাই বাবুকে আমরা ভাই বলে জানি, উনিও আমাদের ভগিনী জ্ঞান করেন, ভগিনীর অপেক্ষা স্নেহ করেন, ওঁর সঙ্গে কথা কওয়া কি দোষের! ভাইয়ের সঙ্গে ভগিনীর আলাপ, নির্জ্জনেই হোক্ আর লোকজনের সম্মুখেই হোক্—দোষাবহ তা তো

জানতুম্ না। তুমি স্বামী, আমি তোমার সহধর্ম্মিনী—তোমার দোষ আমার দেখিয়ে দেওয়া উচিত; সেই জোরে আজ তোমায় বলছি—তুমি এত সন্দিগ্ধ-চরিত্রের লোক কেন? জামাই বাবু দেবতা, ওঁর চরিত্র পুষ্প-রেণুর মত নির্ম্মল, স্ফটিকের অপেক্ষা শুভ্র দেবতার নির্ম্মাল্যের মত পবিত্র।" পরুষ-কণ্ঠে বিদ্রূপ-ব্যঞ্জক-স্বরে শরৎ বলিল "বল, বল আরও কিছু বল। জামাই বাবু তোমাদের দেবতা—কেমন? সে চণ্ডালকে"—"ছি, ছি, একথা বলতে—এমন কুৎসিত কথা উচ্চারণ করতে—তোমার প্রাণ কেঁপে উঠলো না, মুখে বাধলো না?" "হাঁ প্রাণ কাঁপা উচিত ছিল, মুখে বাধা উচিত ছিল; কিন্তু তুমি যখন মনে মনে বরণ করা স্বত্বেও বাক্যের ললিত ছটায় সমস্ত কথা চাপা দিতে চাও ও পার—তখন আমি কেন পুরুষ হ'য়ে আমার প্রাণ কাঁপিয়ে তুলবো!" কথা গুলি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। আমার মনে হইল শ্বাসের উষ্ণতা দরজার বাহিরে আসিয়া আমাকেও তাপ প্রদান করিল। তার পর উভয়ের অনেক কথা হইল। সমস্ত কথা শুনিয়া আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। মনে মনে ভাবিলাম ছি, ছি, শরৎচন্দ্রের একি ক্ষুদ্রতা, একি কাপুরুষতা! আমার মাথায় কলঙ্কের পশরা তুলিয়া ধরিতে সে এত উৎসুক কেন?

স্থিরভাবে কত কি ভাবিতেছি—এমন সময় চপলার একটি কথা

আমার কাণে পৌছিল। সে বলিল "দেখ তুমি যাহা বলিবে আমি হাসিমুখে তাহা পালন করিব, আর তাই করিবার জন্যেই আমাদের জন্ম ; কিন্তু নিরপরাধীকে বৃথা অপরাধের কালিমায় কলঙ্কিত করিও না। পরের দোষ খুঁজিতে গিয়া নিজের মনকে কষ্ট দিও না। আমাদের সুখের সংসার দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করিও না।"

আমি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। অজ্ঞান অবস্থায় দরজার বাহিরেই বসিয়া পড়িলাম। ইতিমধ্যে দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া শরচ্চন্দ্র বাহিরে আসিতেই—সম্মুখে আমাকে দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে আমায় যেরূপ সম্ভাষণ করিল—তাহা কথনই শিষ্টাচার-সম্মত নহে। চপলা এক নয়—শতবার শরচ্চন্দ্রকে ফিরাইতে চেষ্টা করিল ; কিন্তু কপালের ফের, কালের গতি, সময়ের দোষ, চপলা কি করিবে। শ্রীমানের তর্জ্জন গর্জ্জনে আমার স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আমার নিন্দাবাদ শুনিয়া সতী পিতৃ-গৃহে প্রাণ বিসর্জ্জনের উদ্যোগী হইবার অভিপ্রায়ে প্রলয় ঘটাইল। ইত্যবসরে আমার জ্ঞান সঞ্চার হওয়ায় আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং আমার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া নিজ শয়ন কক্ষে প্রবিষ্ট হইলাম। যাইবার পথে আমি স্পষ্ট শুনিলাম—চপলা স্বীয় স্বামীকে বলিল

"ছি, ছি, দিদি যে রকম অভিমানী—সে নিশ্চয়ই একটা কিছু না কিছু করবে।"

তারপর আরও দুইমাস চলিয়া গিয়াছে। আমাদের বাড়ীতে (আর শ্বশুর বাড়ী নয়) এখন কাক্ চিল বসিতে পায় না, সর্ব্বদাই একটা না একটা বিষয় লইয়া গণ্ডগোল, ঝগড়া, কেলেঙ্কারী—লাগিয়াই আছে। শ্বশুর মহাশয়ের সযত্নরক্ষিত, শান্তি পরিপূরিত হর্ষ-সঙ্গীত মুখরিত—সুখের সংসার আজ তাঁহারই বুদ্ধিভ্রমে—না, না, ঘর জামাইদের হিংসার আগুনে—তাদের দানবীয় আচার-ব্যবহারে—পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইল। সংসারে বুঝি এমনই হয়। দেবতার সিংহাসনে দানবের অধিরোহণ, দেবভোগ্য যজ্ঞ-হবি কুক্কুর কর্ত্তৃক ভক্ষণ—এই বৈচিত্রময় সংসারে আজ নূতন নয়। যাহা হউক অবশেষে ইহাই স্থিরীকৃত হইল, যে জামাইবাবুরা আর এক সঙ্গে থাকিবে না, নিজ নিজ অংশ বুঝিয়া লইয়া—যে যেমন সে তেমন থাকিবে। ফলেও দাঁড়াইল তাই।

তারপর আরও দুইমাস চলিয়া গিয়াছে। চপলার সঙ্গে আর আমার আদৌ সাক্ষাৎ হয় নাই, এমন কি বিশেষ বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তাহার কোনো খবরও লইতে পারি নাই। এই চারিমাস চপলাকে না দেখিয়া, তাহার সহিত কথাবার্ত্তা না কহিতে

পাইয়া, আমার মানসিক অবস্থা সত্য সত্যই বড় খারাপ হইয়া উঠিয়াছিল। আপ্যায়িতে, স্নেহে—চপলা আমার ভগিনীর স্থান অধিকার করিয়াছিল, আর তাহার আদর যত্নে আমিও ভগিনীর অভাব কখনও অনুভব করিতে পারি নাই। কোনো কারণে মনে কষ্ট পাইলে, চপলার সহিত কিছুক্ষণ বাক্যালাপ করিলে—তাহার মধুর-আপ্যায়নে আপ্যায়িত হইতে পারিলে—সকল দুঃখ, সকল কষ্ট—সেই মুহূর্ত্তে বিস্মৃত হইতাম। চপলা আমায় খাইতে না দিলে আমার ক্ষুধা মিটিত না, সে না হাসিলে আমার হাসি ফুটিয়া উঠিত না, চপলার সহিত দিনান্তে একবার সাক্ষাৎ না হইলে আমার কোনো কার্য্যে মন উঠিত না। কিন্তু সেই আমি—তাহার অদর্শনে চারিমাস কাল কাটাইয়া দিয়াছি। কেমন করিয়া এই সময় অতিবাহিত করিয়াছি, কি নিদারুণ মর্ম্ম যাতনায় দিবারাত্র জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছি, তাহা শুধু আমি জানি আর আমার অন্তর্যামী জানেন।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে নির্জ্জন প্রকোষ্ঠ মধ্যে একখানি কেদারায় বসিয়া চপলার কথা ভাবিতেছি, তখনও সকল ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া উঠে নাই, সকল মন্দিরে আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজে নাই, হয় তো বা সকল হৃদয়ে অন্ধকারের ছায়াপাত হয় নাই,

এমন সময়ে দাসী ঘরে আলো দিতে আসিয়া সংবাদ দিল—যে চপলার বড্ড ব্যায়রাম। কি জানি কেন বুকের ভিতরে সহসা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, দম বন্ধ হইয়া আসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আপনাকে প্রকৃতিস্থ বুঝিয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি ব্যয়রাম খেন্তা?" পুরাতন দাসী খেন্তা অনেক কথাই বলিল—কিন্তু আমার কাণে আসিল শুধু শরৎচন্দ্রের অযথা পত্নী-নির্য্যাতন্। চতুর্দ্দিক হইতে গোলমাল উঠিতেছিল, আকাশ-বাতাসও যেন হাহাকার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। চোখে অন্ধকার দেখিলাম, প্রাণ মন আকুল আবেগে কাঁদিয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে আমাদের বাড়ী ছাড়িয়া, আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়া চপলাদের বাড়ীতে আসিয়া—কখন যে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া—রোগিণীর শিয়রে বসিয়া অধোবদনে অশ্রুপাত করেতিছি ও যন্ত্রচালিতের মত অঙ্গুলি সঞ্চালনে চপলার কপালের কুঞ্চিত তৈলহীন কেশরাশি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা বুঝিলাম তখন—যখন ঔষধের শিশি হস্তে শরৎচন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া—আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "পাজি, বেইমান কোন্ স্পর্দ্ধায় তুমি আমার বাড়ীতে অসিতে পার। ভাল

চাও তো এইদণ্ডে দূর হয়ে যাও।" আমি ভাবিলাম শরৎচন্দ্র কি ক্ষিপ্ত! সময় অসময় জ্ঞান কি তাহার নাই। আবার মনে হইল—যে বিদ্বেষ-বহ্নি অন্তরে প্রজ্জলিত যখন—তখন আবার সময় অসময় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি! হায় হিংসা—তোমার এ উগ্রচণ্ডা মুর্ত্তি কেন? ন্যায়—অন্যায়, সম্ভব-অসম্ভব, সত্য-মিথ্যা কি তুমি বোঝ না? কি জানি কেমন তোমার ধারা! কেমন তোমার স্বভাব! তোমার চোখে ভাল নাই—সব মন্দ, তোমার প্রাণে দয়া নাই—শুধু নির্ম্মমতা, তোমার শিক্ষায় বিশ্বস্ততা নাই—কেবল অবিশ্বাস, তোমার কাছে শান্তি নাই—আছে শুধু অশান্তি! সুখ দেখলে তোমার প্রাণ ফাটে, নির্ব্বিবাদী দেখলে তোমার হৃদ্‌কম্প হয়, আরাম-প্রিয় জানলে তোমার গাত্রদাহ উপস্থিত হয়! ধন্য—সৃজন-কর্ত্তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃজন তুমি। চিন্তার অন্তহীন—সীমাহীন সাগরে ভাসমান্ যখন—তখন আবার শরচ্চন্দ্রের মেঘমন্দ্র গর্জ্জন আমার শ্রুতিগোচর হইল। স্পষ্ট শুনিলাম দ্বেষভারে জর্জ্জরিত শরৎ বলিতেছে "পাজী, বেইমান, এইদণ্ডে আমায় বাড়ী হ'তে দূর হয়ে যা।"

আমি সত্য সত্যই ব্যথা অনুভব করিলাম। ভগিনীর শক্ত ব্যায়রাম—ভ্রাতা আজ কপালদোষে অযথা নিগৃহীত, নিপীড়িত,—অসম্ভব অভিযোগে অভিযুক্ত। অভিমানিনী আমার স্ত্রী—আমার

এই অপমানে গর্জ্জিয়া বলিয়া উঠিল "চুপ কর ছোটলোক, পাজী তু—ই। আমার এমন সরলা ভগিনীকে তুই আজ মৃত্যুর মুখে তুলে দিচ্ছিস্। তার সরল প্রাণে দাগা দিয়ে তুই আজ তার এই দশা করেছিস। আমার স্বামী—যে তোদের ভাল বই মন্দ কখনও দেখে না—চপলাকে যে নিজের বোনের মত জানে,—মূর্খ, তার উপর তোর এই মিথ্যা সন্দেহ, অযথা গালি বর্ষণ! চপলা, বোনটি আমার, তোর রাক্ষসে স্বামীর হাতে পড়ে—তোর এই দুর্দ্দশা!" মৃত্যু-অঙ্কশায়িনী—চপলা ইঙ্গিতে তাহার মুখরা দিদিকে নিজ স্বামীকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিল; তারপর চপলার মত একবার উঠিয়া স্বামীকে সজোরে নিজের কাছে টানিয়া লইল। এইরূপে উত্তেজিত হইয়া উঠায়—চপলার মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত পড়িল! পর মুহূর্ত্তেই চপলা অবশ হইয়া শয্যার উপর পড়িয়া গেল। লজ্জা, অভিমান, নির্যাতন সমস্ত ভুলিয়া আমি চপলার গায়ে হাত দিয়া নাড়া দিলাম, কিন্তু কোনো সাড়া পাইলাম না। ব্যাপার দেখিয়া আমার স্ত্রী সজোরে ধাক্কা দিয়া ডাক দিল—কিন্তু সব নিস্তব্ধ। হায়, হায় চপলার প্রাণ-পাখী তখন উষ্ণ কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত-ক্ষেত্রে—বহুদূরে উড়িয়া গিয়াছে। ক্ষণিকের মধ্যে ক্রন্দনরোলে গৃহখানি মুখরিত হইয়া উঠিল।

নির্ব্বাক নিস্পন্দ আমি—আমার বাক্য স্ফুরণ হইল না। শুধু একটি মাত্র উষ্ণশ্বাস আমার বক্ষ পঞ্জর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল। একটি বার শুধু ভাবিলাম—এই কি বিধির বিধান্!

৩

জীবনের প্রেম-পর্য্যায়

বাল্যকাল হ'তেই ভালবাসা বল, কিম্বা ভালবাসার নেশাই বল, আমার বেশ অল্পেই আসে, এবং এখন পরিণত বয়সে এটা একটা কঠিন রোগে দাড়িয়েছে। কাউকে ভাল না বাস্‌লে, কারও কাছে থেকে ভালবাসা না পেলে—আমার যেন একদম চলে না। অবশ্য এ রকমটা অনেকেরই হয়, কিন্তু আমার একেবারে অন্যরকমের। একটা জিনিষকে যে বরাবর ভালবাসা—এটা যেন আমার ভাগ্যের ফল নয়। কারণ ঠিক যেটার উপর ভালবাসাটা বেশ প্রগাঢ় হয়ে দাঁড়ায়—অদৃষ্ট-দোষে হয় সেটাকে হারিয়ে ফেলি, নয় সেটা আমার মায়া কাটিয়ে, আমার কথাবার্ত্তা না ভেবে, আমার কাছ হতে দূরে সরে যায়। ঠিক যে হঠাৎ সরে যায়, তা নয়—যেন একটু দাগা দিয়ে যায়। সূর্য্য যেমন সকাল হতে একটু একটু করে সরতে সুরু করে' সাঁঝের বেলায় অদৃশ্য হয়ে যায়, —আমার ভালবাসার পাত্র-পাত্রীও ঠিক সেইরূপভাবে এমন ক্রমশঃ

জীবনের প্রেম-পর্য্যায়

আমার অদৃষ্ট-আকাশ হ'তে সরে গিয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়,—যে সেই জমাটবাঁধা অন্ধকারে বুঝতে পারি—আলোটার কি উজ্জ্বলতাই না ছিল! সূর্য্য সে দিনকার মত যায় সত্য, কিন্তু আবার তেমনিভাবে তার পরদিন সকালেই হাস্‌তে হাস্‌তে উঠে, কিন্তু আমার যে যায় সে আর ফিরে আসে না, এমন কি ফিরিয়ে আন্‌বার চেষ্টা করলেও সে চেষ্টা ফলবতী হয় না। তাইতে বেড়ে যায়—শুধু যাতনা, বুকে উঠে শুধু হা-হুতাশ, চোখের কোণে গড়িয়ে যায় শুধু অশ্রুধারা, মনের মাঝে বেড়ে যায় শুধু গভীর ক্ষত! এমন তর কেন হয় তার কারণ কিছু ভেবে উঠতে পারি না। কারণ ঠিক করলে হয়তো এমনটা আর হয় না, কিন্তু ভালবাসা যাকে বলে, অভিধানে ভালবাসার যে সূত্র আছে,তার সঙ্গে সূত্রের ধারে আমার ভালবাসা মিলে যায়, তবুও আমার ভাল-বাসার উচিত দাম মেলে না; উচিত কেন, দামই মেলে না। আজ পর্য্যন্ত যত ভালবাসাবাসি আমি করেছি—তার মধ্যে আমার স্বার্থের নাম গন্ধ নাই। প্রতিদান পা'ব বলে কখনও ভালবাসি নাই।

ভালবেসে সুখ পেয়েছি—তাই ভালবেসেছি; কিন্তু পাথরকে ভালবেসে তো আর জীবন কাটে না, মনও বোঝে না। যে

ভালবাসা বোঝে না, তাকে ভালবেসে কার সুখ হয়? প্রতিদান না দিক্—বোঝাতো চাই। একটা লোক প্রাণ দিয়ে, মন দিয়ে, ধন দিয়ে, যৌবন দিয়ে, স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে একজনকে ভাল বাসবে—প্রতিদানতো সে দেবেই না, উপরন্তু সে ভালবাসাটা কি তাও বুঝবে না! এ কেমনতর ব্যাপার! যেমনতর ব্যাপারই হোক, আমার এটা যেন মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা—আছে। আমি এ ব্যাপারটির যেমন ভুক্তভোগী—এমন আর একটি জীব এ জগতে আছে কিনা জানিনা। অবশ্য এরূপ জীব বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব তা বলতে পারি না, তবে আমার এ বিষয় জানা নাই। যদি এরূপ জীবের অস্তিত্ব আছে—তা হলে আমি তা'কে একবার মাত্র চোখে দেখিতে চাই। দেখব শুধু—সে কি করে বেঁচে আছে, দেখবো সে যন্ত্রণায় ছুটোছুটি করছে—না আমারই মত এই রকম প্রবন্ধ লিখছে।

জগতে অনেককে আমার কাহিনী শুনিয়েছি, অনেকের কাছে আমাকে একেবারে বিলিয়ে দিয়েছি, কিন্তু কেউ সে কাহিনী শোনে নি, কেউ বিলিয়ে দেওয়া জিনিষ আদর করে' তুলে নেই নি, এমন কি কেউ সমবেদনা প্রকাশসূচক একটি কথাও কখন বলে নি। বদলে—পেয়েছি শুধু ভ্রুকুটি, কৌতুকধ্বনি আর—অবহেলা। অনেক

যা পেয়েছি, তাই আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—কাউকে মনের কথা জানাব না। আর জানাবার কোনো কথাও নেই। তাই পুরানো পাঁজি ঘেঁটে প্রবন্ধকারদের দল পুষ্ট করতে বসেছি। ক্রটি মার্জ্জনীয়।

ছেলেবেলায়—তখন আমার বয়স সবে সাত বছর কি আট বছর হবে, ভালবাসার কি জানি ছাই তখন, তবুও ভালবাসা পড়লো একটি ফলটুঙ্গি পাখীর উপর! পাখীর উপর!! পাখীটি ছিল আমার এক দূর-সম্পর্কীয় দাদা, তারই। তাদের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে নজর পড়লো ঐ লাল-সাদায় মেশান পাখীটির উপর। অমনি ধরে বসলুম পাখীটা আমার চাই। দরখাস্ত মঞ্জুর হয়ে গেল। পাখীটিকে এনে তাকে একটা বেশ ভাল পিতলের খাঁচায় রাখলুম। পাখীকে খাইয়ে তার খাওয়া শেষ হ'লে তবে আমি নিজে খেতুম। যে ঘরে আমি শুতুম পাখীটাকেও সেই ঘরে রাখতে লাগলুম। মনে হ'ল বিহঙ্গ-বধূ বুঝি আমারই—শুধু আমারই। চৈতন্যটা ভাঙ্গল সেই দিন—যেদিন দেখলুম পাখীটা আর কিছু খাচ্ছে না, একবারে নেতিয়ে পড়েছে। এমন যে সিঁদুরে ও পাটল মেঘের মত রং, সেটা কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে। এক রাত্রির মধ্যে এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন! দেখতে দেখতে প্রভাত সমীরের শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে আমার বড় সাধের

খেয়াল

পাখীও শেষ নিশ্বাস ফেলে—আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। চলে গেল—কিন্তু রেখে গেল শুধু বুকভরা উষ্ণশ্বাস, চোখ ভরা জল, মর্ম্ম-ভেদী হাহাকার। আমার যে এত ভালবাসা—বিহঙ্গ বধূ আমার তা বুঝলে না। তা বুঝতে পারলে, আমার হৃদয়ের আবেগ, প্রাণের টান, আকুল আগ্রহ, আর ব্যাকুল বেদনা—সামান্য মাত্রায় বুঝতে পারলে, পাখী আমায় ফাঁকি দিতে পারতো না। এখন মনে হয় বালকের ভালবাসা—পাগলামীর অপরনাম, পাখী আমার তাই বুঝে পাগলের হাত হ'তে দূরে সরে গেল। পিঞ্জরের পাখী বুঝলে না যে বালকের ভালবাসায় পাগলামী নাই। সেখানে স্বার্থের পূতিগন্ধ প্রবেশ লাভ করতে পারে না—সে ভালবাসা কামনাগন্ধ বিহীন, সে অচঞ্চল, পীযূষসিঞ্চিত, নির্ম্মল উদার। অথবা মুক্তক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ-বিচরণ যার চির অভ্যাস—সে সামান্য পিঞ্জরের বদ্ধ বায়ুতে থাকবে কেন? কিন্তু তাকেও তো আমার হৃদয়রূপ মুক্তক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ-বিচরণের সমস্ত সুযোগই দিয়েছিলুম, তবু সে কেন পালিয়ে গেল? না বুঝে বিহঙ্গ-বধূ আমার কেন পালিয়ে গেল! হায়, কে জানে কেন এমন হ'লো। বিহঙ্গ ক্ষুদ্রবুদ্ধি, স্বার্থপর—তাই বালকের এই দেব-দুর্লভ ভাল-বাসার আস্বাদন পেয়েও হেলায় পরিত্যাগ করলে। দিবানিশি

আমার—কাঁদতেই কেটে গেল। পাখী কোথায়—আমার পাখী কোথয়—এই করতে করতে বাল্যকাল ছেড়ে যৌবনে পা দিলুম। তখনও আমার পাখীর কথা ভুলতে পারি নাই। তখনো আমার পাখীর কথায় কান্না আসতো, মন হু হু করতো। এই তো গেল ভালবাসার প্রথম পয্যায়।

মন তো তখন ফাঁকা, ভালবাসার বস্তুবিহীন হয়ে মন-প্রাণ তখন শূন্য। বাহ্যিক-জগতে বৈজ্ঞানিকমতে যেমন কোনো স্থান শূন্য থাকতে পারে না, অন্তর-জগতে বিধিমতে তেমনি হৃদয়-আসন শূন্য থাক্‌তে পারে না। আসনের বুক যখন ব'সবার—জন্য তৈয়ারী—তখন সে নিয়ম লঙ্ঘন করা তার অসাধ্য। আজ খালি থাকতে পারে, কালও হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু চিরদিন সে খালি থাক্‌বে না, কেউ না কেউ তার—বুক জুড়ে একদিন বসবেই বসবে। আমারও হ'ল ঠিক তাই। পাখীটা যাবার পরদিন হ'তেই বুকটা তো খালিই পড়েছিল। এখন সেখানে বসলো আমার বন্ধু—শ্রীমান্ অসিতকুমার। আমাদের মধ্যে বেজায় ভাব, প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, অসাধারণ ভালবাসা। অসিতকে না দেখলে আমার দিন কাটে না, অসিতকে না পেলে আমার খাওয়া হয় না, অসিতকে দুটো মিষ্টি কথা না শোনালে আমার মন

উঠে না, অসিতের সঙ্গে না বেড়ালে আমার ভাত হজম হয় না, তার বাতাস গায়ে না লাগলে কিম্বা তার সাড়া না পেলে আমার বুকের ভিতরকার যন্ত্রগুলো সব অবশ হয়ে পড়ে। এক কথায় পাখীর কথা ভুলে গিয়ে, অসিতকুমারের কথায় মজে গেলুম। অসিত আনলে বিস্মৃতি অসিত আনলে ভবিষ্যতের আশাগীতি অসিত আনলে প্রাণের স্পন্দন, অসিত আনলে হৃদয়ের আলোড়ন। ভুলে গেলুম সব, কেবল অসিত আমার সারা প্রাণটা ভরপূর করে, সমস্ত হৃদয়খানা জুড়ে নিয়ে—বসে রইল। লোকেরা—সমপাঠীরা আমায় কত কি বলতে লাগল, অসিতকেও কেউ ছাড়লে না। শেষে নাচার দেখে নাম রাখলে মাণিকজোড়! আমি পড়তুম তখন এন্‌ট্রান্স স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে, অসিত পড়তো থার্ড ক্লাসে। তার চেহারাটা অবশ্য নাটক নভেলের নায়কের মত ছিল না, কিন্তু চোখ দুটো ছিল দেখবার মত, ব্যবহার ছিল মোলায়েম, আর মুখখানা ছিল হাসিভরা। ঐ হাসিই আমার কাল হয়েছিল—হাসিতেই আমাকে পাগল করে—তুলেছিল। আমি বাড়ী হতে স্কুল আসতুম—আর আমার প্রাণের বন্ধু থাকতো স্কুল সংলগ্ন ছাত্রাবাসে। স্কুল বসবার অন্ততপক্ষে আধঘণ্টা আগে বাড়ী হ'তে বেরিয়ে পড়তুম। সটান্ স্কুলে প্রবেশ না করে

বন্ধুবরের নিকট ছাত্রাবাসে চলে আসতুম। গল্পগুজব করে স্কুলের ঘণ্টাবাজলে স্কুলে প্রবেশ করতুম। টিফিনের ঘণ্টা কতক্ষণে পড়বে, আমরা কতক্ষণে দুজনায় আবার মিলবো এই ভাবেই বিভোর থাকতুম। মাষ্টার কি পড়াচ্ছে কিনা তা শুনবার অবকাশও হত না, প্রবৃত্তিও আসত না। ছুটীর পর সবাই মাঠে ফুটবল খেলবার জন্য যেত, কিন্তু আমরা—খেলবার ধার ধারতুম না। খোলা ময়দানে এসে—লোকচক্ষুর অন্তরালে, হিংসা বিদ্রূপের গণ্ডীর বাইরে বসে, বড় শান্তি বড় আরাম অনুভব করতুম।

আমাদের প্রেম-দরিয়ায় যেন একটানা সুখের জোয়ার ব'য়ে—যাচ্ছিল, তার উপর—অনুকূল বায়ু মৃদুমন্দ-গতিতে, আনন্দ-মুখরিত আশা-পরিপূরিত হৃদয়-তরণীখানিকে তটিনীর মাঝ-বুকে রেখে—বেশ পুলকস্পন্দনে নৃত্য করবার—অবসর দিয়েছিল। আমাদের সুখে, আমাদের আনন্দে—অনেক বুকে দাগা ধরেছিল, অনেক শীতল হৃদয় উষ্ণ হযে উঠেছিল, অপ্রেমিকের মনেও প্রেম কামনা জেগে উঠেছিল, হিংসকের—খলের তীব্র উগ্রতা বর্দ্ধিত হয়েছিল। লক্ষ্যে অলক্ষ্যে অনেকেই আমাদের গন্তব্য-পথের বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা বৎসর চলে গেল, আমাদের প্রণয়ের বাঁধের উপর বিলাতী-মাটির যে পলস্তরা—

ছিল—সেটা আরও কামড়ে' বসে গেল। ভাবলুম বাঁধা অটুট হলো, লুব্ধ প্রণয় জমাট বেঁধে গেল।

চিরপ্রথানুযায়ী স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা-শেষে আমি উঠলুম প্রথম শ্রেণীতে, অসিত উঠলো দ্বিতীয় শ্রেণীতে। আমার পড়া-শুনা ভাল হ'বে বলে, আমার মুরুব্বিপক্ষ আমায় ছাত্রবাসে পাঠালেন, আর আমিও ভগবানের কৃপা লাভ করলুম, দেবতার বর পেলুম—এই ভেবে আনন্দে আটখানা হয়ে বাহ্যিক আমার যা কিছু ছিল—কেন না অন্তরটা তো ছিল সেখানে—যথা—বই খাতা ইত্যাদি নিয়ে ছাত্রাবাসে আড্ডা গাড়লুম। সুখের আর অবধি রইলো না। কিন্তু ভিতর ভিতর যে একটা মহা ষড়যন্ত্র চল্‌ছে, আমাদের প্রণয়-রজ্জু ছিড়বার যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হচ্ছে—তা তখন বুঝি নাই। আমারই কোনো সহপাঠী—তথানামধ্যায়ী-বন্ধু অসিতকে খব ভালবাসার ভূমিকা দেখাতে লাগল! অসিতও চমকে গেল, আমারও প্রাণটা আঁৎকে উঠল। কিন্তু 'সুখে দুখ দিলা বিধি'—এ কথাটা খুব সত্যি হ'লেও সুখের সময় সেটা কেউ ভেবে উঠতে পারে না, আর শেষ ভাব্‌তে গেলেও সুখ করা হয় না। সব কাজ তলিয়ে বুঝে মানব-ইতিহাসে কেউ কখনও করে নাই, করতে পারবে না। তা

হ'লে মানবত্ব বজায় থাকবে না। নভেল নাটকে কিম্বা প্রবন্ধে খুব হিসাবী কিম্বা চিন্তাশীল ব্যক্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে সংসারে তা পাওয়া যায় না, যেতেও পারে না। কবির কল্পনায় সম্ভব হ'তে পারে –কিন্তু বাস্তব-জগতে একেবারে অসম্ভব। মানুষ যদি শুধু ভাব্‌তেই থাক্‌বে—তবে সে তা'র কাজ করবে কখন? আমার মনে হয়—মানুষের সৃষ্টি শুধু তা'র কাজ ক'রবার জন্য, ভাব্‌বার জন্য নয়।

যাক্, হিংসার জয়ই সর্ব্বত্র। তার কারণ আর কিছুই নয়,—হিংসুক তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যত ঐকান্তিক চেষ্টা করে, এত চেষ্টা তো আর কেউ কখনও করতে পারে না, করা চলেও না। কাজেই ঐকান্তিক চেষ্টা জয়লাভ করে, সিদ্ধিলাভ করে। এটা হিংসুকের বাহাদুরী নয়, বাহাদুরী তা'র ঐ চেষ্টার। হিংসুক যদি স্বার্থের জন্য চেষ্টা না ক'রতো – তা হ'লে তা'র কাছ থেকে জগত—ভাল ভাল রকমের অনেক কাজ পেতো। পরোপকারী চেষ্টা করছে পরের জন্য, আর হিংসুক করছে তার নিজের জন্য —প্রথম পরের জন্য চেষ্টা করে' যে সুখ পায়—দ্বিতীয় নিজের জন্য করে' ঠিক সেই সুখ অনুভব করে। সংসারে মানুষের যাত্রার পথ এক—তবে চলবার আদব-কায়দা দুজনের ভিন্ন ভিন্ন। যে পথে

পরোপকারী ও হিংসুক চল্‌ছে—সেইপথে তুমি আমি ঐ—দুটোর মধ্যে একটিও নয়—এ রকম লোকও চল্‌ছে। মাঝে মাঝে তোমায়, আমায়, হিংসুকে, পরোপকারীতে ধাক্কা লাগে, কেউ সাম্‌লে নেয় কেউ বা টক্কর খেয়ে পড়ে যায়। যে সাম্‌লে নিতে পারে সে মনে মনে বিরক্ত হয়, যে টক্কর খেয়ে পড়ে যায় সে গালাগালি ও গলাবাজি ক'রতে থাকে ; আর যাকে সাম্‌লাতেও হয় না, কিম্বা ধাক্কার ধার ধারতে হয় না—সে চুপি চুপি চলে যায়। ইচ্ছা করে' কেউ কারও অনিষ্ট করতে পারে না এবং করেও না। গন্তব্য-পথ এক, তাই সময়ে সময়ে তোমায় আমায় ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়, কাজেই কোনো সময়ে তোমাকে ভাল নাম নিতে হয়—আর অগত্যাপক্ষে আমায় বদ্ নামের ভাগী হ'তে হয় : আবার কোনো দিন আমি সৎ আর তুমি অসৎ হও। দার্শনিক গবেষণা হয়তো বেশী রকমের হয়ে গেল। তা এমনটা মাঝে মাঝে হয়। এ ত্রুটীও মার্জ্জনীয়।

অসিত একদিন সকাল বেলায় উঠে আমার কাছে এসে কেঁদে আকুল। অসিতের কান্না আমার চোখের জল টেনে বে'র ক'রলে। দুজনে এমন ভাবে কাঁদতে লাগলুম—যদি কেউ দেখ্‌তো তা হ'লে বলতো যে নিশ্চয়ই আমাদের বাপ মা মরেছে, কারণ

পরীক্ষায় ফেল হ'লে মুখোমুখী হয়ে আর কেউ কাঁদে না, কিম্বা মাষ্টারেব হাতের বেত পিঠে প'ড়লেও এমন মৃদু অথচ দ্রুত অশ্রু-পাত হয় না। অসিতের মুখ ফুটে' কারণ দর্শাবার সময় হয় না আর আমারও কারণ জানবার বিশেষ কৌতূহল স্বত্বেও মুখ ফোটে না। সহানুভূতির (Sympathetic) অশ্রু কেবল দর দর্ বেগে আমার গণ্ডস্থল বেয়ে, বুক বেয়ে—বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ছিল। দশ পাঁচ মিনিট তো কান্নার স্রোত চললো, তারপব ববং অসিত নিজেকে সাম্‌লিয়ে নিয়ে আমায় সান্ত্বনা দিতে লাগলো। যেটা আমার কাজ সেইটাই অসিতকে ক'রতে হলো এই আমার দুঃখ। অসিত আমায় অনেক কথা বললে—সবগুলির ভাবার্থ তখন ঠিক্ বুঝে উঠ্‌তে পারলুম না তবে তার সহজ সরল মানে হচ্ছে এই যে পূর্ব্বকথিত সহাধ্যায়ী চান্, যে অসিত আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধটুকু বিচ্ছেদ করুক। কেন চান, আর এরূপ চাইবার তাঁর অধিকার কি, কেনই বা তিনি এরূপ অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হবেন, তা সবিশেষ বুঝে উঠতে পারলুম না। কেবলই মনে হ'ল লোকটা কি হিংসুটে! আমার কতদিনের পরিশ্রম—কত দিনের সাধনা-লব্ধ অসিতকে কেন আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়! কেন আমি তা দেবো! না, না, প্রাণ থাকৃতে

অসিতকে ছা'ড়তে পা'রব না, অসিতকে আমার পর ক'রতে পা'রব না, অসিতও পা'রবে না। অসিতকে মনে মনে শত ধন্যবাদ দিয়ে বল্লুম, 'ভাই, এ কথা তুমি আমার কাছে না বল্লেও পা'রতে। কিন্তু তুমি আমাকে চাও, আমি তোমাকে চাই। এই জন্যই এ কথা আমার কর্ণগোচর করেছ। তোমার হাতে ধরি, তোমায় মিনতি করি, তোমার পায়ে ধরি – আমায় ছেড়ো না। আমি গরীব, কিন্তু আমার প্রাণ আছে। আমি কুৎসিত, কিন্তু আমার হৃদয়ে আলো আছে। তোমায় যে আপনার ক'রতে চায় তার চেয়ে আমি কোনো অংশে কম নই। লেখা-পড়ায়, খেলা-ধূলায় গল্প-গুজবে, ক্লাশের পরীক্ষায়, লোককে সন্তুষ্ট ক'রতে, পরের উপকার কর'তে—আমিতো কখনও নারাজ নই, কখনও তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর চেয়ে কোনো বিষয়ে পশ্চাৎপদ নই, তবে আমায় ছা'ড়বে কেন ভাই অসিত?" আবার দুটো চোখ আমার জলে ভেসে উঠলো। শরৎকালে মেঘ উঠলে যেমন ঝপ্ ঝপ্ করে এক পশলা বেশ বৃষ্টি হ'য়ে যায়—আমার চোখ দুটোও তেমনি করে' বেশ এক পশলা বৃষ্টি ঝরিয়ে দিলে! যেখানে মেঘ উঠেছিল—শুধু সেইখানেই বারিপাত হলো। বর্ষার মত বায়ুর সাহায্য পেলে না, মেঘখান্টাকেও সমস্ত আকাশ জুড়ে টান্‌তে পারলে না। কেবল

নিজেই কাঁদলুম, অসিত চুপ করে' নিচুমুখে একটা পেনসিল্ নিয়ে খুঁটতে লা'গল।

তারপর দীর্ঘ দুটি বৎসর চলে গিয়েছে, এর মধ্যে অসিত-কুমারের সঙ্গে আমার এক রকম দেখাই হয় নাই। প্রথম কারণ—অসিতের এক বৎসর আগে আমি কলিকাতা-প্রবাসী হয়েছিলুম, দ্বিতীয় কারণ—অসিত সময়ে রাজধানীবাসী হ'য়েও আমার কাছে কোনোদিন আত্ম-প্রকাশ করে নাই। আমি তা'কে ধ'রতে চাইলেও সে ধরা দিতে চাইত না। সময়ে সবই হয়—এই বৎসর দুটি আমার ও অসিতের হৃদয়ে অনেকটা প্রভেদ এনে দিয়েছিল। নদীর ভাঙ্গন যেমন একবার আরম্ভ হ'লে ক্রমশঃ চলতেই থাকে, হৃদয়ের গরমিল একবার আরম্ভ হলে, তেমনি বেড়ে' যেতে সুরু হয়। আমার ও অসিতের মধ্যেও তাই হ'ল। একটা বরফ গলা বান এসে আমাদের হৃদয়-নদীর কূলে ভাঙ্গন সুরু করে' দিলে। অসিত আমার নিতান্ত পর হয়ে উঠলো। আমিও অগত্যা অসিতের পর হয়ে দাঁড়ালুম। কল্‌কাতায় তখন মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ কোনো কলেজ-মেসে থাকি, আর অসিত বঙ্গবাসী কলেজের মেসে—বোবাজারে থাকে, কদাচ কখনও দেখা হয়। দেখা হলেও আর তেমন তৃপ্তি আসে না, কৌতূহল বাড়ে না,

আনন্দ-হিল্লোল প্রবাহিত হয় না, নয়নে প্রেম প্রতিভাত হয় না, তবে উঠে শুধু—ছোট-খাট একটা- আধটা দীর্ঘশ্বাস, আর মরম-ভাঙ্গা উচ্ছ্বাস। সেগুলির প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ'বার পূর্ব্বেই আবার রাস্তায় জন-কল্লোলের মাঝে মাঝে দু'জনেই মিশে যাই। অসিতের ও আমার মধ্যে এ বিষম ভেদাভেদ হয়ে গেল, তার কারণ সম্যক বুঝতে না পা'রলেও সমস্ত কার্য্যে তা বেশ পরখ্ করতে লাগলুম। বল্‌তে ভুলেগেছি, যে ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ ক'রবার ঠিক পরে—কল্‌কাতা এসে কলেজে ভর্ত্তি হ'বার—ঠিক আগে আমার বিয়ের ব্যাপারটা চুকে গিয়েছিল। কাজেই বিয়ের ক'নের প্রেম-বন্যায় হাবু-ডুবু না খাইলেও—হয়তো অনেকেই ঐ কথাটা ধরে নিয়ে, ন্যায় শাস্ত্রের গণ্ডীতে এনে Premise তৈয়ারী করে' একটা সিদ্ধান্তে (Conclusion) উপনীত হ'বেন ;—আর (Conclusion) সিদ্ধান্তটা অসিতকুমারের সহিত আমার প্রণয়-ব্যাপারের যে স্বাভাবিক বাধা, সেটা সপ্রমাণ ক'রতে তৎপর না হ'লেও ইতস্ততঃ ক'রবেন না। তাই তাঁদের সাবধান ক'রবার জন্য নয়, নিজের একটা কৈফিয়ৎ দিবার জায়গা রাখ্‌বার জন্য বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি—যে আমার পরিণয়-ব্যাপারটা মোটেই সুখের হয় নাই। নববধূর সৌন্দর্য্য-দোষ

কিম্বা তার ভীত-চকিত সলজ্জ-চাহনি কিম্বা অশিক্ষিত অথবা অর্দ্ধশিক্ষিত অমার্জ্জিত ব্যবহার আমার অসুখের কারণ হয়েছিল —তা নয়। এক কথায় বল্‌তে গেলে আমায় বল্‌তে হয়, যে আমার এই পরিণয়-ব্যাপারটা এমন সময়ে সংঘটিত হ'ল—যখন আমার মন আদৌ বিয়ের পানে আকৃষ্ট হয় নাই। গীত-বাদ্য ও বরযাত্রিদের কোলাহল কিম্বা রসিকাদের পরিহাস আমার কাণে পৌঁছিয়ে বিয়ের ব্যাপারটা দৃঢ়ীভূত করে নাই। এর কারণ এত-খানি গল্পাংশ পাঠ কর্‌বার পরও যদি জান্‌তে না পারেন তা হ'লে আমি আর নিজে বল্‌তে চাই না। মন আমার বলে, "অসিত, তুমিই আমার এ সর্ব্বনাশ ক'রলে। তোমার—দেওয়া প্রাণ ফিরিয়ে নিয়ে খুব মহত্বের পরিচয় দিলে। তুমিও মন নিলে না, ঘরেও মন রাখ্‌তে দিলে না। মন নিয়ে একটা ছেলে-খেলামি করে আমার সারা জীবনটা নষ্ট ক'রলে।"

সেবার ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিচ্ছি। সব বিষয়ের পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে,—বাকী শুধু রসায়ন-শাস্ত্র; গ্রীষ্মাবকাশের ২।৪ দিন মাত্র বাকী। আমি একাকী কৌমুদীস্নাত মেসের বারান্দায় একখানি অর্দ্ধ-জীর্ণ মাদুরের উপর শুইয়া রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার কথা ভাবিতেছিলাম। ভাবিতে ভাবিতে কি জানি কেন

উপরোক্ত কথাগুলি আমার মনে পড়িয়া গেল। হয়তো এও রাসায়নিক-ক্রিয়ার একটা প্রতিযোগ। ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ নড়িয়া অতি অস্ফুটভাবে আমার জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে কথাগুলি বাহির হইয়া নিশ্বাসের সঙ্গে চতুষ্পার্শিক বায়ুতে মিশাইয়া গেল। অতীতের বিষাদমাখা কাহিনী আমার মানস চক্ষের সম্মুখে বেশ পরিস্ফুট হইয়া দেখা দিল। চোখের কোণে অজানিতে অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া উপাধান সিক্ত করিল না বটে—তবে ক্ষণিকের জন্য দাগ ধরাইতে ক্রটী করিল না।

পরীক্ষা-শেষে সকলেই বাড়ী ফিরিবার আয়োজনে যৎপরোনাস্তি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটী করিতে লাগিল; কেহ বা মনের আনন্দে—

"বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী,
শুনিব বিরহ-বিধুর অধরে মিলন-মধুর হাসি"—

গানে মেস-গৃহ তোলপাড় করিয়া তুলিতে লাগিল, কিন্তু আমার যেন কিছু ভাল লাগিতেছিল না। বুকের মাঝখানে কে যেন একখানা বৃহৎ পাষাণ রেখে মাঝে মাঝে ঝুঁকি মারছিল, আর—তা'র প্রতি-আঘাতে যেন আমার বুকের দলগুলি নুইয়ে পড়ছিল। কোনো সহপাঠী আমার এই বিপরীত ভাবের

কথা জিজ্ঞাসা করলে একটু কাষ্ঠহাসি হেসে উত্তর দিয়েছিলুম 'ভাই পরীক্ষা ভাল করে দিতে পারি নাই' কাজেই ফূর্ত্তি আসছে না।' অবশ্য কারণ ও অকারণের মাঝখানে পড়ে পরীক্ষার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হ'তে পারি নাই; কিন্তু পাশ ক'রব যে নিশ্চিত—এটা প্রশ্নপত্রের উত্তর দিবার পর বেশ বুঝেছিলুম। মায়ের শত চেষ্টা, স্ত্রীর সহস্র অনুরোধ—আমায় বাড়ী নিয়ে যেতে পারলে না। কোনো সহাধ্যায়ী হৃদয়বান্ বন্ধুর সহিত ঢাকা চ'লে গেলুম। বলা বাহুল্য অবকাশের সমস্ত দিনগুলি ঢাকায় কাটিয়েছিলুম। পরীক্ষার ফল বেরুলে জানলুম, যে আমি দ্বিতীয় বিভাগে—ইণ্টারমিডিয়েট অফ আর্টস্ পরীক্ষায় পাশ হয়েছি। আনন্দও ছিল না নিরানন্দও ছিল না।

অবকাশান্তে কলিকাতার সমস্ত কলেজ এবং কলেজ-স্কোয়ার যখন ছাত্রের সংঘর্ষে মুখরিত ও উষ্ণ হইয়া উঠিল—তখন একবার বাড়ী ফিরলুম। মাকে প্রণাম করে—ভ্রাতা-ভগিনী ও স্ত্রীকে দেখে পুনরায় কলিকাতায় ফিরে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হলুম। আমার এ কৃতকার্য্যে মিত্রেরা সুখী হইল—শত্রুরা হাসিল। সমস্ত বন্ধুদের নিকট হইতে অভিনন্দন—(Congratulation) পত্র পেলুম,—পেলুম না শুধু তা'র কাছ থেকে—যা'র পত্র পেলে

আমি বুঝতুম, যে আমার পাশ করা সার্থক হয়েছে। সুখে-দুঃখে, আনন্দে-নিরানন্দে, হাসি-কান্নায়, থিয়েটার-বায়স্কোপে, ব্রাহ্মসমাজ গতায়াতে দিন এক রকম বেশ কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু বিচিত্র—এই জগতে এক রকমভাবে দিন কাটাবার সাধ্য কা'রও নাই। কাজেই অল্পদিনের মধ্যে আমার ভিতরেও বিচিত্রভাবের পরিস্ফুরণ দেখা গেল। কোনো ব্রাহ্ম-ধর্ম্মী বন্ধুর সহিত আমার বেশ যেন প্রণয় জমিয়া গেল। তাদের বাড়ীতে আমার অপ্রতিহত গতি। বন্ধুর ভগিনী বিবাহিতা অথচ পতি পরিত্যক্তা। বয়সে যুবতী, গুণে সরস্বতী, হৃদয়ে ভক্তি-মতী, ব্যবহারে বালিকা, দেখিতে সুকোমল-কলিকা, কর্ম্মে সুদক্ষা, সঙ্গীতে নিপুণা, আলাপে নবীনা, জ্ঞানে প্রবীণা—সদা হাস্যময়ী গুণান্বিতা এই রমণীর পতি—হায় বিধি তোমার এরূপ অবিচার কেন ?—ঐ রমণীর পতি ব্যভিচারী—লম্পট—পানাসক্ত কুক্রিয়ারত! বন্ধুর গৃহে বন্ধু, তার মা, তার বড়-মা (মাসীমা) ও এই সর্ব্বগুণসম্পন্না বিদুষী,—বাড়ীশুদ্ধ সকলেই আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখ্‌তো, বাড়ীর ছেলে-ভেবে, আমার সঙ্গে আবাধে পান-ভোজন, গল্প-গুজব, আহার-ব্যবহার করতো। আমিও দ্বিধা-বিহীন মনে, সরলপ্রাণে তাদের সঙ্গে আপনাকে

বেশ মিশিয়ে দিতে পেরেছিলুম। কলেজ-শেষে সমস্তক্ষণই আমি তাদের গৃহে বিরাজমান থাকৃতুম। নয়টা বাজলেই মেসে উপস্থিত হবার জন্য সকলের কাছে বিদায় নিয়ে—হালকা-প্রাণে যে ঠিক্ তা বলতে পারি না,—যাই হোক কোনো রকমে আবার মেসে ফিরতুম।

অসুখ হওয়ার জন্য প্রায় আজ ৭ দিন তাদের বাড়ী যেতে পারি নাই। আমার বন্ধু রোজ তাদের বাড়ী হ'তে আমার জন্য নানারকম ফল, ও 'কেমন আছ' এই মর্ম্মে অমলার হাতের লেখা—একখানি চিঠি আন্‌ত'। তার পর আরও দুদিন কেটে-গেছে—আমার বন্ধুও আসে নাই, ফলও আসে নাই, কেমন আছি পত্রও আসে নাই। মন বড় উতলা হলো—ফলের জন্য যতটা হোক না হোক—চিঠির জন্য! সামান্য একটী পাঁউ-রুটীর টোষ্ট্ খেয়েই বন্ধুদের বাড়ী আসবার জন্য বের' হলুম। বাড়ী এসে শুন্‌লুম যে অমলার পতি Lever complain এ (যকৃৎ-যন্ত্র-দোষে) আজ দুদিন হ'ল মারাগেছে। অমলার শুভ্র বস্ত্র পরিধান, অবিন্যস্ত কেশ, মলিন বদন—তার সাক্ষ্য প্রদান ক'রছিল। অমলার সহিত কথায় বুঝলুম যে সে কতদূর পতি-প্রাণা রমণী। পতির শত দোষ সত্ত্বেও সে তার অনুগামিনী

ছিল। এই ব্যাপারে চিন্তাশীল মন আমার—সমাজের কথা, মানুষের কথা—সবচেয়ে মানুষের মনের কথা ভাবতে লাগলুম; অসুস্থ শরীর—তাই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ দেখিয়া বিদায় নিলুম। তারপর দুই বৎসর কাটিয়া গেছে। তখন আমি University Post Graduate ক্লাসের ছাত্র। আমার ব্রাহ্ম বন্ধু জ্যোতিস—তখন কলিকাতা Secretariatএর কোনো বিভাগের একজন মোটা মাহিনার কেরাণী! অমলার সঙ্গে আমার খুব খাতির জমিয়াছিল। সত্যের খাতিরে বলা উচিত অমলা আমাকে ভালবাসিত, আমিও অমলাকে ভালবাসিতাম। তবে ইহাও বলা উচিত যে অমলা ভালবাসাটা যতখানি ঘোরাল করে দেখতে পারত—আমি ততটা পারতুম না। তাহার কারণ আমার মনে হইত, অমলা মেয়েমানুষ, ভালবাসার বিজ্ঞানে পূর্ণ সিদ্ধ। অবশ্য কেহ যেন ভাববেন না যে আমিই অমলার সঙ্গে কথা কইবার, বেড়াবার, গল্প-গুজব করবার একা অধিকারী ছিলুম। আমার মত M. A. ক্লাসের ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত অনেক যুবক, অনেক উকীল, ব্যারিষ্টারেরও এ অধিকার ছিল। কেন থাকবে না? সমাজ যে বাধা দেয় না নিয়ম যে ঘাড় উঁচু করে না। এতে তো জাত যায় না, অনিষ্টও হয় না। যদি কোনো অনিষ্ট হয় তবে এ সমাজেও সেটা হ'তে

পারে—অন্য সমাজেও হ'তে পারে, আর হয়েও থাকে। তবে এ সমাজের শুধু—দোষ দিয়ে লাভ কি? দোষ—সমাজ বিশেষের নয়, দোষ—পাত্র-পাত্রীর, অতএব পাত্র-পাত্রী-বিশেষের জন্য—কোনো সমাজকে দোষী—সাব্যস্ত করা নিতান্ত গর্হিত। যাইহোক, সময় বেশ কাটতে লাগলো। অমলা আমায় বিশেষ স্নেহ করতো, আর আমিও মাঝে মাঝে সব ভুলে গিয়ে মনে মনে বল্‌তে থাকতুম 'বাঃ, চমৎকার'! একদিন ভোরে উঠেই শুনলুম অমলার আবার বিবাহ। কার সঙ্গে কখন তার কিছু স্থিরতা নেই—তবে বিবাহ যে হবে এটা কিন্তু ঠিক। মনটা তো বড় দ'মে গেল, তবে অনেক পোড় খেয়েছি, অনেক দাগা বুকে ধরেছি তাই মনটাকে চঞ্চল হতে দিলুম না। একটা বাহ্যিক ক্ষমতা—মানসিক ক্ষমতার উপর চড়িয়ে দিয়ে—তার মাথাটা নিচু করেই রাখতে লাগলুম। সন্ধ্যা-বেলায়—ঠিক হতাশা যে তা নয়,—তবে আশাও নয়, হয়তো দুরাশা হ'তে পারে,—তাই না নিয়ে অমলার কাছে গেলুম। অমলা আমাকে দেখে কাঁদতে লাগল।' বললে—"উপেন, তুমি আমায় ক্ষমা কর। সমাজ আমায় আবার বাঁধতে চায়,—সমাজ আবার আমার উপর আধিপত্য নিতে চায়—মা, বড়মা, ভাই—সমাজে যেখানে যে কেউ আছে—সকলের ইচ্ছার

বিরুদ্ধে আমি কোথায় একলাটি দাঁড়াব? আর দাঁড়াতে চাইলেই বা জায়গা দেবে কে? অমলা এখানে একটু চুপ করিয়া গেল, ভাবলুম আমার উত্তরের অপেক্ষা করছে। আমিও অন্যমনা হ'য়ে বললুম "না,—অমলা, জায়গা—জায়গা কে দেবে? তুমি মায়ের কথার—অবাধ্য হয়ো না। জীবনের এক অধ্যায়ে সুখ পাওনি আর এক অধ্যায়ে দেখ সুখ পাও কি না? যখন তোমার হিতা-কাঙ্ক্ষীর দল বলছে—সুখ পাবে, তখন আমিও বলছি সুখ পাবে।" "উপেন তুমি কি বলছ? সুখ—জীবনে হয়নি, আর হবেও না। তুমি কেন আমাদের সমাজভুক্ত হওনা উপেন?" এ কথার জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলুম না। কি যে উত্তর দেব তা ঠিক না ক'রতে পেরে—শুধু অমলার ঈষৎ রক্তাভ মুখের পানে অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম। নিরুত্তর দেখে অমলা পুনরায় বললে "সে কি উপেন, তুমি আমার সুখের পথে কণ্টক হ'বে? শোন উপেন যদি আমায় আবার দ্বিতীয়বার বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে হয়, তা'হলে সে বন্ধন মেগে নেব শুধু এক তোমার কাছ থেকে। আমায় কত দিন কত লোকে কত কি বলেছে—মা, বড়-মা, জ্যোতিদা কত লোকের ঘাড়ের উপর আমায় ফেলে দিতে চেয়েছে—তোমার নাম যে করেনি তা নয়—তবে বাধা ঐখানে—তুমি আমাদের সমাজভুক্ত

নও—কিন্তু উপেন বলে রাখছি, আমি যদি কাউকে ফের আপনার করবার চেষ্টা করি—তা হ'লে সে কেবল তুমি, তুমি, তুমি। আজ হ'তে অমলা শুধু তোমারই, সে শুধু তোমারই।" অমলা বালিকার ন্যায় রোদন করিয়া উঠিল। আমি অতিশয় অপ্রতিভ হয়ে—পাছে বাড়ীর কেউ জানতে পারে এই আশঙ্কায় ও লজ্জায় তাড়াতাড়ি তাহার চোখের জল আমার রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করলুম। অমলার গায়ে আমি এই প্রথম হাত দিলুম। গা কেঁপে উঠলো সত্য; কর্ত্তব্য আমায় সিধে রাখলে,—বিনা সঙ্কোচে তার—চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে, তার ঘর্ম্মাক্ত কপোল হ'তে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বায়ুতাড়িত অলক রাশি সরিয়ে দিলুম; শেষে অনেক বেলা হয়ে গেল দেখে বিদায় নিলুম, কিন্তু মেসে ফিরে এল শুধু আমার—ধড়খানা। খেয়ে দেয়ে বিছানার উপরে কত জানা, কত অজানা, কত নূতন, কত পুরাতন কত আঁধার, কত আলো, কত ভাল, কত মন্দ ভাবতে লাগ্লুম। মন খিঁচড়ে গেল, চোখ্ জড়িয়ে এল, মাথার মধ্যে কেমন করতে লা'গল। তার পর ঠিক—জানি না—যখন ঘুম ভাঙ্গলো—দেখি সব ঘরেই আলো জ্ব'লছে। চাকর এসে আমার ঘরের আলোর স্থইসটী ও টেনে দিযে গেছে। ঘড়ি-পানে তাকালুম, দেখি রাত্রি ৮টা।

খেয়াল

উঠেই দেখি মাথার কাছে এক খানা টেলিগ্রাফ। ব্যস্ততার সহিত খামখানা ছিঁড়ে ফেল্‌লুম, দেখলুম—আমার স্ত্রীর বড় ব্যায়রাম। আমাকে বাড়ী যাবার জন্য মায়ের আদেশ। রাত্রি দশটার গাড়ীতে বাড়ী গেলুম। যখন বাড়ী পৌছুলুম তখন সবে ভোর হয়ে আস্‌ছে। কেবল কাকগুলোই ডাক ধরেছে—অন্যান্য পাখীদের কেবল পাখা-নাড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে মাত্র। যা হোক, ভাবী আশঙ্কায় সদর-দরজার পাশে এসে দাড়ালুম, কাণ-পেতে শুন্‌লুম—কিছুই সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। বাড়ীটীর নিস্তব্ধতা বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হ'ল। ডাকবা-মাত্রই দারোয়ান এসে দরজা খুলে সেলাম করে জিজ্ঞাসা করলে "ছোটি বাবু, আপ্‌কা তবিয়ৎ আচ্ছা হৈতো?" আমি একটী "হু" করিলাম মাত্র এবং জিজ্ঞাসা করিলাম যে বাড়ীর খবর কি? দারোয়ানজি "সব আচ্ছা—হায়" বলিয়া সরিয়া দাড়াইল। আমি কারণ বুঝিতে পারিলাম না। ভাবিলাম যদি আচ্ছাই হায়—তবে এ প্রতারণার কি প্রয়োজন? যাই হোক নিঃশব্দে গৃহ-প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়ালুম। ততক্ষণ দারোয়ান বাড়ীর সকলকেই একরকম জাগিয়ে তুলেছে। অল্পক্ষণেই আমার শয়নকক্ষে গিয়ে দেখলুম—আমার স্ত্রী ঠিক সুস্থ অবস্থায়

অৰ্দ্ধ-ঘোমটার মাঝখানে পালঙ্কের উপর সশরীরে বর্ত্তমান। এইরূপ ভাব দেখে আমার সমস্ত শরীর রাগে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। কি বলবো কি করবো ঠিক কর্‌'তে না পেরে হ'ঠতে লাগলুম এমন সময়ে আমার স্ত্রী হা'সতে হা'সতে নিকটে এসে বল্‌লে "কি গো বিধবা-বিবাহের কত দূর?" রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। তবুও উত্তর—প্রত্যুত্তর করলুম না। প্রবৃত্তি হোল না। পুনরায় গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া চেয়ারের সম্মুখস্থ টেবিলের উপর এক খানি পত্র দেখলুম। লেখাটা যেন অসিত কুমারের মত ঠেক্‌লো, চিঠিখানা পড়ে বুঝলুম অসিত আমার শত্রু। সে এই পত্রে আমার ও অমলার কথা লিখেছে। মনের অবস্থাও সহসা কিরকম হয়ে গেল। হৃদয়ের শত ক্ষোভ, দারুণ যন্ত্রনা, বিষম ক্রোধ সবগুলো একসঙ্গে জমাট বেঁধে কাউকেও মাথা তুলবার অবকাশ দিলে না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় আমি মূর্খের মত বসে রইলুম। দূরে কে প্রভাতী-স্বরে গেয়ে উঠলো—"আমি তোমারই, আমি তোমারই"। হাস্য-মুখে স্ত্রী আমায় সমস্ত বুঝিয়ে বল্‌লে। আমি নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে আখ্যান্ শুন্‌তে লাগলুম। আমার হাত ধরিয়া আমায় পালঙ্কের উপর টেনে নিলে। হর্ষে তার ডাগর ডাগর চোখদুটী অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে—অবনত

হ'য়ে গেল এবং আমার কোলে মাথা রেখে' কাঁদতে লাগিল। আমি বিস্ময়াবিষ্ট পটের ছবিটীর মত এক দৃষ্টে এই দৃশ্য দেখ্তে লাগলুম। * * * * * * *

কলিকাতায় ফিরে এসে M. A. পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়েছি। পরীক্ষাও দিয়েছি—ফলও বের হয়েছে, কিন্তু আমি এবার আর পাশ করতে পারি নাই। কলিকাতা হ'তে স্থানান্তরে যাবার জন্য আয়োজন উদ্যোগ কর্‌ছি, এমন্ সময় জ্যোতিদার নিকট হ'তে একখানি পত্র পেলুম। পত্রখানা খুলে দেখ্‌লুম "অমলা কোনো জমিদার ও উকিলের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে—দিন ধার্য্য হয়েছে আগামীকল্য। এ শুভ-কার্য্যে আমার যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, এই অনুরোধ"। পত্রখানটা হাত হ'তে আপনি পড়ে গেল। এদিকে বাক্‌স গোছাতে লাগলুম, সহসা কাপড়ের ভাঁজ হ'তে একখানি অনেক দিনের পত্র বেরিয়ে পড়লো। লেখা অমলার, —প্রাণ কাঁপতে লাগল সংসারটা চোখের সাম্‌নে যেন ডগ্‌ ডগ্‌ করে ভাস্‌তে লাগলো। পত্রখানটী পড়ি মনে হ'ল, কিন্তু আবার ঘৃণায় তখনই ব্যাকুল চোখ দুটো ফিরিয়ে নিলুম। পাশের ঘরে করুণ-স্বরে কে গেয়ে উঠলো—

যবে প্রথমে তোমায় দেখিয়াছি, এখন আছে তা স্মরণে।

যবে প্রথমে ভালবাসিয়াছি এখন আছে তা মরমে।"

দীর্ঘ নিশ্বাস.—একটা শুধু আগুনের ফুল্‌কি আমার নাসারন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে গেল—সমস্ত ঘরখানায় যেন আগুনের হাওয়া বইতে লাগ্‌ল। আমার মনে পড়লো সেদিনের কথা—অমলার কথা, তার প্রতিজ্ঞা,—তার মুখ আর তার শপথ—"ওগো আমি তোমারই আমি তোমারই"! হায় নারী তোমার প্রাণ কি দিয়ে তৈরী—পুরুষগুলো কি তোমার কাছে খেলার—ক্রীড়নক। তোমার ধর্ম্ম, তোমার প্রতিজ্ঞা কি পদ্ম-পত্রের জল? তাই মহাদুঃখে মহাকবি Milton বলেছেন Woman frailty is thy name (হে নারী, চপলতা তোমার অপর নাম) এত বড় বড় কবির এত বড় বড় কথা জানা সত্বেও—M. A. পাশ করতে পারলুম না এই দুঃখ;—আর দুঃখ এই যে অনেক বই মুখস্থ করলুম, পুস্তকে অনেক নরনারীর চরিত্র-বর্ণনা দেখলুম, কিন্তু নারী-চরিত্রের মহিমাই বল—মাধুর্য্যই বল –বুঝতে পারলুম না। এ দুঃখ রা'খবার আমার আর স্থান নাই। শুধু এ দুঃখ কেন আরও অনেক দুঃখ রা'খবার স্থান নাই—অথচ রাখতেও হ'বে। এই টুকুই হচ্ছে এই সংসারের ধারা। অমলার বিয়ের দিন উপস্থিত হ'তে পারি নাই; কিন্তু শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নেই সুসম্পন্ন হয়েছিল। আশ্বস্তও হলুম

দুঃখিতও হলুম। বলা বাহুল্য—নিজেকে সুখী করবার জন্য যতটা না হোক, দশের গঞ্জনা এড়াবার জন্য আবার যথাসময়ে কলিকাতায় University কলেজে আমায় পুনঃ প্রবেশ ক'রতে হ'ল। এবার যেন কল্‌কাতার আসরটা সর-গরম রাখতে পারলুম। কারণ আর কিছু নয়—এবার আমার প্রেম-পর্য্যায়ে ভাটা ধরেছিল। প্রেম-দরিয়ার বুকে শেওলা জমে তার দফা-রফা করতে বসেছিল। তা হ'লেও স্বভাব যায় না মলে, আর ইল্লত যায় না ধুলে। আমি প্রেম করবার জন্য পাত্র-পাত্রীর অনুসন্ধান যে না করেছিলুম তা নয় কিন্তু আর জুটে উঠলো না। তাই চির-পুরাতন কিম্বা চির-নূতনই বল—স্ত্রীর পত্রগুলির জবাব দিয়ে প্রেম-পর্য্যায়ের ধারা সঠিক রাখবার সুব্যবস্থা ক'রতে আরম্ভ করলুম। বেশ মোলায়েম ভাষায়, করুণ-স্বরে, কোমল-ঝঙ্কারে, স্ত্রীর সকল পত্রগুলির উত্তর—সমানভাবে দিয়েছিলুম। এতদিন পরে স্ত্রী আমার হাতে স্বর্গ পেলে, আর আমিও গত্যন্তর-বিহীন হয়ে একটা নকল স্বর্গ সৃজন করার আন্দাজেই রইলুম। মাঝখানে এক বার বাড়ী গিয়েছিলুম। সেখানে শুনলুম—স্ত্রী নাকি আমার সব ভাই-বোনদের বলে বেড়িয়েছে, যে তার যে এমন হবে সে আশা—সে কখনও করে নাই। কথাটা কাণাঘুষো হয়ে গ্রামের অনেক সভা-সমিতিতে,

আসর-মজলিসে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেখানকার নেতারা বড়-গলায় নাকি বলেছিল "যে ওহে কলেজের ছোকরাদের প্রথম প্রথম এমন ধারাটা হয়েই থাকে, আবার যখন বোঝে তখন 'খেল্‌ খেল্‌ নড়েই বস' হয়ে যায়।" মেয়ে-মহলেও এরই মধ্যে রামায়ণ মহাভারত পড়বার দলেরা নাকি একটা নিলাম-ইস্তাহারের মত আর্জ্জিই তৈয়ারী করেছিল—একদিকে সতীর নাম, অপর দিকে তার মতিভ্রষ্ট পতির নাম। হাল-ফেসানের মেয়েরাও রায় দিতে বাকী রাখে নাই। তারা নাকি বলেছিল 'বদলে গেল মতটা, ছেড়ে-দিলাম পথটা'। যা হোক, মায়ের আদরে, স্ত্রীর যত্নে, ভাই বোনদের মধুর আপ্যায়নে—এক সপ্তাহ বেশ কেটেছিল—মনে আস্‌ছে। আরও মনে আছে—বিদায় নেবার সময়ে স্ত্রীর বিনয়-নম্র-সম্ভাষণ। তার ব্যাকুলিত প্রাণের আকুল আগ্রহ, আর পিপাসিত নয়নের সজল দৃষ্টি, সব চেয়ে মনে আছে। শুধু মনে আছে নয়—মনে গাঁথা আছে তার এই শেষ কথা গুলো—'ওগো,—আবার কবে আস্‌বে'।

অনেক দিন হলো কল্‌কাতায় ফিরে এসেছি। আমাদের M. A. পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেছে। সাত দিন পরীক্ষাও দিয়েছি,—বাকী আর এক দিন মাত্র। পরীক্ষার কয়দিন আমার

কথানুযায়ী স্ত্রী আমায় রোজ রোজ একখানা করে পত্র লিখ্‌ত, আমি সকাল বেলায় পত্রখানা পড়ে গিয়ে পরীক্ষাগারে বেশ মনের আনন্দে দ্বিগুণ স্ফূর্ত্তিতে প্রশ্ন পত্রের উত্তর লিখ্‌তুম। আজ (Essay-paper) রচনা-বিষয়ের পরীক্ষা,—গত রাত্রে সেজন্য তেমন কিছু পড়ি নাই, আজ সকাল বেলাও পড়বার চেষ্টা করি নাই,—শুধু ডাক পিয়নের অপেক্ষায় ইতস্ততঃ করে বেড়াচ্ছিলুম। ৯টার সময় পিয়ন এসে পত্র দিলে—কিন্তু তার মধ্যে আমার,—ওগো, তোমরা কেউ আমায় ঠাট্টা করোনা,—আমার প্রিয়তমার কোনো পত্র পেলুম না। কত-কি মনে হ'ল—ভাবলুম হয়তো সময় পায় নাই, না হয় পত্র ডাকে দিতে দেরী হয়েছে। সাত পাঁচ ভাবনার মাঝখানে মনটা একবারে দমে গেল। মনে পড়লো তার শেষ কথা "ওগো আবার কবে আস্‌বে!"

বেলা তিনটার সময় পরীক্ষাগার হ'তে বেড়িয়ে সটান মেসে এলুম—হায় অদৃষ্ট, পেলুম এক খানা Telegram। কি জানি ভাবী অমঙ্গল-আশঙ্কায় মুখটা একবারে শুকিয়ে গেল, বুকটাও ধড়ফড় করে—উঠলো। আমি—খাম খানটা ছিঁড়ে ফেল্‌লুম বটে কিন্তু ভিতরের সংবাদ আমার কম্পিত হৃদয় ছিঁড়ে ফেল্‌লে! বালকের মত রোদন ক'রতে লাগ্‌লুম। ব্যাপার দেখে ২।১ জন

সহপাঠী এসে উপস্থিত হ'ল। সংবাদ শুনে তারাও বাক্যহীন হয়ে গেল। যাই হোক, রাত্রির ট্রেনে হতাশ-হৃদয়ে, বাড়ী ফির্‌লুম। ভাব্‌লুম যে এ সংবাদটাও যদি মিথ্যা হয়—যেমন একবার হয়েছিল। কিন্তু হায়, কি হ'ল, বাড়ীর দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই রোদনের রোল আমার কাণে গেল, আমার চোখ আপনি বুজে এল মাথাও ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। মা, আমাকে দেখে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, আমার কাণে গেল শুধু "বৌমা, লক্ষ্মী-মা—আমার কি দোষে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে।" নিমিষে সমস্ত বুঝ্‌লুম। কি করব—বাধ্য হয়ে হৃদয় মন সংযত কর্‌লুম। ভাব-লুম বিধি কি Unique (সম) ভাবেই আমার অদৃষ্টটি গড়েছিলে।

তার পর অনেক দিন চলে গেছে, M. A. পাশও করেছি—কিন্তু এখন আর মানুষের মন খুঁজে বেড়াই না, মানুষের জন্য লালায়িত হই না, মানব-সমাজের কোনো ধার ধারি না। সকল প্রেমের আধার যিনি—তাঁরই পাদপদ্মে হৃদয়মন সমস্ত সমর্পণ করেছি,—আশা—এবার আর—ফাঁকি পড়বো না। কি বিড়ম্বনা, কি যন্ত্রণা—তবু যেন মাঝে মাঝে মনে হয়—কাণের কাছে কে বলে 'ওগো আবার কবে আস্‌বে'।

৪

কর্জ্জণা ষ্টেশনের নিকটে আসিয়া আমাদের রথচক্র সহসা বসিয়া গেল। চালকের শত চেষ্টা, সহস্র বংশীবাদন এবং আরোহীদিগের সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্ত্বেও রথ অচল, অটল, স্থির, নিথর ! বোধ হয় মহাভারতের যুদ্ধপর্ব্বে কর্ণের রথচক্র ও বসুন্ধরার গ্রাস হ'তে—২।১ হাতও পিছাইয়াছিল, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ কাটোয়া হইতে বর্দ্ধমান-অভিগামী—আরোহী-পরিপূর্ণ গাড়ীখানি এক ইঞ্চিও নড়িল না। 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবে থাকিয়া মাঝে মাঝে অভিমানভরে শুধু ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য যে যেমন সে তেমন গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া সারথির দিকে ধাবমান হইল—আমিও তাহাদের মধ্যে একজন। নিকটে গিয়া শুনিলাম যে অত্যধিক বৃষ্টি হেতু রাস্তার অনেক স্থানেই ভাঙ্গন্ ধরিয়াছে। গাড়ী আজ আর বর্দ্ধমান যাইবে না। হায়, কালই যে আমার পরীক্ষা আরম্ভ !

এই নিদারুণ বারতা শুনিয়া সকলে কি করিল বা কি ভাবিল বলিতে পারি না; কিন্তু আমি সংজ্ঞালুপ্ত হইয়া বজ্রাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় মাটিতে পড়িয়া গেলাম। যখন জ্ঞান হইল—চাহিয়া দেখিলাম, আমি একটী ঘরে একখানি খাটের উপর শুইয়া আছি। এক পার্শ্বে একটী ডিজের আলো মৃদু-মন্দভাবে জ্বলিতেছিল। মাথার কাছে বর্ষিয়সী একটী রমণী; অনতিদূরে একখানি চেয়ারে আমার সহপাঠী বন্ধু ললিতমোহন। জ্ঞান-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে মাথার অসহ্য বেদনা অনুভূত হইল এবং মাথায় হাত দিয়া বুঝিলাম যে কয়েকটী ব্যাণ্ডেজ বেশ সুদৃঢ়ভাবে জড়িত রহিয়াছে। বুকের স্পন্দন তখনও সুস্পষ্ট ও দ্রুত। এমন সময়েও—মৃত্যু-মন্দিরের সিংহ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া—মনি-ব্যাগটার কথা ভুলিতে পারি নাই। তাই বাহিরে ও ভিতরে পুঞ্জীভূত বেদনারাশি বর্ত্তমানেও একবার পকেটে হাত দিলাম—কিন্তু ব্যাগটীকে দেখিলাম না! তাহার মধ্যে যে একশত টাকার একখানি নোট ও আমার বড় সাধের এম-এ, পরীক্ষায় বসিবার জন্য রেজিষ্ট্রারের অনুমতি-পত্র ছিল। কিন্তু হায় আমার যে সে—সাধের মাথায় বাজ পড়িয়াছে তাহা সম্যক্ জানিয়াও ভুলিয়া গেলাম। ক্ষণিকের চিত্তচাঞ্চল্য এবং মানব সুলভ-চাপল্য আমায় শয্যা হইতে উঠাইবে এমন

সময়ে ললিত আমার আছে আসিয়া বলিল, "থাক্ ভাই, উঠ্‌বার চেষ্টা করো না—তোমার মনিব্যাগ আমার কাছেই আছে।" ছি, ছি, লজ্জায় আমার অর্দ্ধ-শুষ্ক মুখ সম্পূর্ণ শুকাইয়া গেল। ভাবিলাম ললিত আমায় কি মনে করিল। বষিয়সী রমণীই বা কি ভাবিলেন। রোগশয্যায় অর্দ্ধমৃত অবস্থায় এখনও অর্থের ধান্দা! তাড়াতাড়ি এক নিশ্বাসে বলিলাম "ললিত, না, না সে কথা নয়। আমার এম-এ, পরীক্ষার রসিদ তাইতে আছে ভাই।" অমনি একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস আমার বুকের উপর ঘনাইয়া উঠিল—বাহির হইতে পারিল না, কিন্তু চোখের জলের ভিতর দিয়া বুঝি সেটা বাহির হইয়া গেল। তাই বুঝি অশ্রুবিন্দু বড়ই উষ্ণ অনুভূত হইল। ললিত বলিল,—"হেমেন, তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন ভাই! সব আছে। আগে সেরে উঠ, তারপর সব হবে'খন।"

আমার কত কথা মনে হইল। সব চেয়ে যেন গতকল্য ও আগামীকল্য এই দুইদিনের কথা অধিকতর চঞ্চলতা ও মানসিক উদ্বেগ আনয়ন করিল। মস্তকের অসহ্য বেদনাও এ সবের কাছে হার মানিয়া গেল। মনে হইল কাল যে জননী আমায় কত আশীর্ব্বাদ করিয়া—কত দেবদেবীর মন্ত্রপূত পবিত্র নির্ম্মাল্য আমার

মাথার উপর রাখিয়া—কলিকাতা আসিবার জন্য বিদায় দিয়াছিলেন, কত আশা বুকে রাখিয়া—ভবিষ্যতের কত সুখচ্ছবি মানসনেত্রের সম্মুখে ধরিয়া—আশীর্ব্বাদের ভাণ্ডার শূন্য করিয়া আমায় এম-এ পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা রওনা করিয়া দিয়াছিলেন। আর মনে পড়িল কাটোয়া ষ্টেশনে ললিতের সহিত অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ। হায়! সেই সাক্ষাতই যে আমার এই ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে, তাহাও আমার স্মরণ-পথে উদিত হইল। আরও ভাবিলাম যে, মা আমি তোমার একমাত্র নয়নের নীলমণি, অন্ধের যষ্টি, আঁধারের আলো, জীবনযাত্রার পথের পথনির্দ্দেশক, আমারই মঙ্গল কামনায় তোমার সারা প্রাণটী ভরপুর করিয়া—আমারই সিদ্ধির আশায় আমারই পথ চাহিয়া যে বসিয়া আছ, তবে এ দুঃসংবাদ কি তোমার প্রাণে সহ্য হইবে? এত পূজা, এত অর্চ্চনা এত মানস কি তোমার সকলই বৃথা হইবে? না, না, যাহা কখনও হয় নাই তাহা কিরূপে হইবে? যতই ভাবি ভাবনা ততই কূল ছাপাইয়া উঠে। প্রাণপণ চেষ্টায় অতীত-চিন্তা বিসর্জ্জন দিলাম, কিন্তু ভবিষ্যৎ আসিয়া শূন্যস্থান অধিকার করিয়া বসিল। মনের সুখে মনের আনন্দে উথলিয়া উঠিতেছিলাম, তাহা বুঝি বিধির বিচারে অসহ্য হইয়া উঠিল। তাই এক অচিন্ত্য

নীয় কারণে আমার ভাগ্যবিধাতা অলক্ষ্যে থাকিয়া ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধাইয়া দিলেন।

পাশ ফিরিয়া শুইতে গিয়া দেখিলাম দরজার পাশে একটি ব্রীড়াবনত—সুশ্রী, উজ্জ্বল, সুন্দর নোলক পরা মুখ। দেখিয়া মোহিত হইলাম কিনা ঠিক বলিতে পারি না; তবে ক্ষণিকের আমার সমস্ত বেদনা—যাবতীয় শারীরিক কষ্ট—মানসিক উত্তেজনা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। বালিকাটির স্বভাব-সুন্দর-মুখ যাহার নজরে পড়িবে—সেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইবে, এই স্থির নিশ্চয় বুঝিলাম। বালিকার হস্তে একটি বাটী ছিল। হস্তস্থিত বাটিটী দেখিয়া বুঝিলাম যে, পাত্রটি আমারই পানীয় কোনো পদার্থ বুকে করিয়া ধরিয়া আছে। মা বলিলেন "শৈল, দোর গোড়ায় দুধের বাটী হাতে করে সঙের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস্ যে? এখানে নিয়ে আয়।" বুঝিলাম বালিকার নাম শৈল; কিন্তু এত সুকোমল গোলাপ-ফুলের পাঁপড়ির নাম করণের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে পারিলাম না। নির্লজ্জের মত আমিই বলিলাম "শৈল দুধ কি গরম" আছে? শৈল যেন সরমে এতটুকু হইয়া গেল। এক ঝলক রক্তও তাহার মুখের প্রতি শিরায় বেশ টকটকে হইয়া দেখা দিল; কিন্তু পরক্ষণেই

রক্তাক্ত মুখখানি পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। বুঝিলাম বালিকা লজ্জাশীলা। শৈল কোনো কথা কহিল না দেখিয়া মা বলিলেন, "হ্যাঁলো, মুখে রা নেই যে? হেমেনকে এত লজ্জা কিসের? সে যে ললিতের মত আমারই আর এক ছেলে।" শৈল তখনই ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল; কিন্তু কি ভাবিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। তারপর মায়ের পানে তাকাইয়া ত্বরিতপদে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। আমারও মনে হইল কি একটা জিনিষ হারাইয়া ফেলিলাম। মনে হইল শৈলকে কি কেহ ফিরাইয়া আনিতে পারে না? তাহার মুখের একটা কথাও কি শুনিতে পাই না? আমার লজ্জার বাঁধ আপনি ভাঙ্গিয়া গেল। আমি বলিলাম "শৈল, যা জিজ্ঞাসা করলুম তার উত্তর না দিয়ে যে বড় চলে গেলে?" বলিয়াই তৎক্ষণাৎ লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেলাম। বালিকার মাতা বলিলেন "শৈল, তুই হেমেনের কথায় উত্তর না দিলে সে দুধ খাবে না। শীগ্‌গির আয় বল্‌ছি।" বালিকা তখন হয়তো দরজার বাহিরেই দাঁড়াইয়া ছিল; তাই ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে গৃহমধ্যে আসিয়া মায়ের পাশে দাঁড়াইল—কিন্তু সাহস হইল না, মুখ তুলিবার ভরসা পাইল না। আমি বলিলাম "মা, ও ছেলেমানুষ, ওর বড্ড লজ্জা হয়েছে।

ওকে যেতে দিন। আমি দুধ খাচ্ছি।" মুখে বলিলাম 'যেতে দিন' কিন্তু সে কথাগুলা যেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে উচ্চারিত হইল। শৈলবালার মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম—সে যে আমারই পানে তাকাইয়া আছে। দৃষ্টি আমারই উপর আবদ্ধ, অথচ যেন চিন্তার রেখা তাহাতে পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি মনে করিলাম শৈল হয় তো ভাবিতেছে যে বিদেশী-অতিথি—রোগশয্যাশায়ী,—তাহার সহোদর ভ্রাতার সহাধ্যায়ী বন্ধু—যদি সত্য সত্যই না খান তবে তো তাঁহার বড় কষ্ট হইবে। তাই কথা কহিবার প্রবল ইচ্ছা সত্বেও লজ্জায় কথা ফুটিতে দিলনা। তাই ক্ষমাভিক্ষার জন্য বুঝি ঐ পদ্মআঁখির করুণ চাহনি আমারই উপর নিবদ্ধ ছিল। নারীহৃদয় এত কোমল, এত করুণ, এত সলজ্জ ভাবিয়া যুগপৎ বিস্ময়ে ও আনন্দে আমার স্বেদাপ্লুত মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। ভাবান্তর কেহ লক্ষ্য করিল কি না বুঝিলাম না, তবে মনে হইল মায়ের চোখে বুঝি আমার হৃদয়ের ভাব প্রতিফলিত হইয়া গেল।

* * * * * * *

দীর্ঘ দুইটা বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমি এখন প্রেসিডেন্সি-কলেজের ইংরাজী-সাহিত্যের অধ্যাপক। বহুবাজারে হিদারাম ব্যানার্জ্জীর

গলিতে আমার বাসা। চিরকালই আমোদ-প্রমোদ ভাল বাসিতাম; কিন্তু যতদিন 'পড়ো' ছিলাম—ততদিন বেশ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি নাই, এখন আর সেদিকে কোনো বাধাই ছিল না। কাজ-কর্ম্ম অতি অল্প; সপ্তাহে সবেমাত্র ১২ঘণ্টা করিয়া কলেজের কার্য্যে আবদ্ধ থাকিতাম, আর বাকী সময় বন্ধু-বান্ধবদের সহিত খেলা-ধূলা ও গান-বাজনা লইয়া ব্যস্ত থাকিতাম। এইস্থলে আমার একটু সামান্য পরিচয়ের আবশ্যক বোধে সেটুকু বলিয়া রাখি। মুর্শিদাবাদ জেলার কোনো পল্লীগ্রামে আমাদের বাস। বাড়ীর লোকের মধ্যে আমি, মা, বাবা ও একটী মাত্র ভগিনী। আমাদের প্রায় বার্ষিক ৫।৬ হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি ছিল। কাজেই "নিরস্ত পাদপেদেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে" গোছ—আমাদের বেশ পশার-প্রতিপত্তি ছিল। যেবার আই এ, পরীক্ষায় পাশ করিয়া প্রথমস্থান অধিকার করিলাম, সেইবারেই আমার পিতার কাল হইল। দুঃখিনী মা, পুত্র ও কন্যার মুখ চাহিয়া কোনো মতে প্রাণশূন্য দেহ লইয়া বাঁচিয়া রহিলেন। তারপর আরও দুই বৎসর সুখে-দুঃখে কাটিয়া গেল এবং সেই অবসরে আমার ভগিনী সুশীলা বিবাহিতা হইয়া একেবারে পর হইয়া গেল। তখন মা—শুধু আলালের ঘরের দুলাল আমাকে লইয়াই ব্যস্ত রহিলেন।

মায়ের বড় ইচ্ছা যে তিনি একটী সৎপাত্রী আনিয়া তাঁহার পুত্রবধূ-ত্বের পদে প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু আমার—আবদার-বায়নায় তাঁহাকে আমার এম-এ পাশ দেওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার জন্য বুকে বল বাঁধিতে হইল। স্নেহ-পরায়ণা মা আমার সদা-সর্ব্বদাই বলিতেন, "বাবা হেমেন, এইবার একটী ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে কর। বৌমার উপর সমস্ত সংসারটা চাপিয়ে দিয়ে আমি কাশীবাস করিগে।" আমিও অমনি আবদারের স্বরে বলিতাম "মা এ তো তোমার দেখ্‌ছি বড় সর্ব্বনেশে বুদ্ধি! কোথায় পরের মেয়ে ঘরে নিয়ে এসে তাকে একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান ক'রবে, আদর-যত্ন ক'রবে, তা না, একেবারে তার কচি মাথায় একটী ভারি বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়বার মৎলব। সে পরের মেয়ে, তার ঘাড় থাক্‌লেই বা কি আর ভেঙ্গে গেলেই বা কি।" মা স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিতেন "না-রে না, ঘাড় যাতে না ভাঙ্গে—সে ব্যবস্থা করে—তবে আমি সরে যাবার ব্যবস্থা করব।"

এইরূপভাবে মায়ে-পোয়ে দিনগুলি একরকমভাবে কাটাইয়া দিতামঃ। অভাব-অভিযোগ আদৌ ছিল না এবং থাকিবার কোনো হেতুও ছিল না। কত স্থান হইতে কত জমীদার—কত হাকিম আমার বিয়ের সম্বন্ধ, টাকার তোড়া ও সুন্দরী কন্যা লইয়া আমাকে

এবং মাকে কতই না বিরক্ত করিত। মায়ের স্নেহে-গড়া প্রাণ, অমিয়-মাখা বচন, মধুর,-আলাপন, সম্মান-রক্ষা-জ্ঞান সকলকেই তুষ্ট করিয়া বিদায় দিত। কেহ রুষ্ট বা বিরক্ত হইলেও কোনো কথা বলিতে সাহস করিত না। আমি সেবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা এম-এ, দিবার জন্য সাজিয়া-গুজিয়া কলিকাতা আসিতেছিলাম, এমন সময়ে কাটোয়া ষ্টেশনে আমার বাল্যের সহপাঠী ললিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি যখন কাঁদি-স্কুলে পড়িতাম—তখন ললিতের পিতা সেখানে প্রথম মুন্সেফের পদে কার্য্য করিতেন। ললিত ও আমি এক শ্রেণীতেই পড়িতাম এবং উভয়েই সুতীক্ষ্ণ-মেধাবী-ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলাম। আই-এ, পাশ করিবার পর ললিতের পিতা হঠাৎ হৃদরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং পিতৃশোকে ললিত অতিরিক্ত মাত্রায় কাতর হইয়া সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত হয়। কোনো রূপে মৃত্যুর মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ডাক্তারের পরামর্শে ললিত পড়াশুনা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল।

দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর ললিতের সহিত কাটোয়া ষ্টেশনে আমার অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ—আমাদের সুপ্তপ্রায় প্রণয়কে একেবারে সজাগ করিয়া তুলিল। সেইজন্যই—আমাদের এই মিলনানন্দ

সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিবার মানসে—ললিতের সহিত বর্দ্ধমান হইয়া কলিকাতা যাইব বলিয়া—ম্যাক্‌লিয়ড্ কোম্পানির গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম; যেদিন যাত্রা করিয়াছিলাম—ঠিক্ তাহার পর দিন হইতে আমাব পরীক্ষা আরম্ভ, নতুবা ললিতদের কর্জ্জণার বাড়ীতে ২।৪ দিন থাকিয়া যাইবার প্রলোভন পবিত্যাগ করিতে পারিতাম না। তাই আপাততঃ এ প্রসঙ্গ মনের কোণে উঠিয়া চকিতে মনেই মিলাইয়া গেল; রহিল শুধু মানসিক যাতনা আর তাহাব পরিপোষকার্থ শুধু বাহির হইল একটী হতাশার দীর্ঘশ্বাস।

মানুষ গড়ে আর অলক্ষ্যে থাকিয়া বিধাতা শুধু তাই ভাঙ্গে। আমার পক্ষেও এ উক্তির কোনো ব্যতিক্রম ঘটিল না। আমার রচিত ছবি বিধাতা ভাঙ্গুন বা নাই ভাঙ্গুন—আমার কাতরোচ্ছ্বাস যে তাঁহার কাণে পৌছিয়াছিল—এটা বেশ জোব করিয়া বলিতে পারি। তাই পূর্ব্ব-কথিত আকস্মিক বিপদ আমার ঘাড়ে চাপাইয়া আমায় ললিতদের বাড়ীতে আনিয়া ফেলিলেন।

যাহা হউক, আমি একদিন সন্ধ্যার পর বন্ধু-বান্ধবদের লইয়া সঙ্গীতালাপে মাতিয়া উঠিয়াছি, এমন সময়ে ললিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার উপস্থিতিতে আমার প্রাণে পুলকস্পন্দন বহিয়া গেল। নিমেষের মধ্যে কল্পনা-যানে আরোহণ করিয়া কত অজানা-

অচেনা-দেশে পরিভ্রমণ করিয়া ফেলিলাম। নোলক-পরা একটু-খানি কচি মুখের স্পষ্ট ছবি আমার হৃদয়ের সমস্ত স্থানটা অধিকার করিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে ললিতদের গৃহে ঠিক এই সময়ে এক সপ্তাহকাল অবরোধের কথা, শৈলবালার সলজ্জ-চাহনি, মন্দ-মধুর গতি-ভঙ্গী, স্পষ্ট অথচ মৃদু-সরল ভাবময়ী কথাগুলি—আমার স্মৃতি-পটে কোন্ অজানা নিপুণ চিত্রকর তাহার রঙ্গিন তুলিতে ফুটাইয়া তুলিল। নিজের ভাবে নিজেই বিভোর হইয়া ভাবাবেশে মূক হইয়া রহিলাম। গৃহেমধ্যে তখনও সঙ্গীত পূর্ণমাত্রায় ধ্বনিত হইতেছিল। সঙ্গী-সাথীদের হাস্য-কলরব আসর বেশ সরগরম রাখিয়াছিল; কিন্তু আমার মানস-বিহঙ্গ তখন এ সবের গণ্ডী ছাড়াইয়া বহু দূরে কোন্ নিরালা পল্লীতে একটী নির্জ্জন গৃহ-প্রাচীরের মাঝে উড়িয়া বসিয়া যেন কোন প্রিয় বস্তুর সন্ধান করিতেছিল। সহসা ললিত আমার কাছে আসিয়া কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল; আমি তখনও নির্ব্বাক, তখনও স্বপ্নাবেশে ভাব-রাজ্যে বিচরণ করিতেছিলাম। ললিত কোনো প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া আমার পাশে বসিয়া পড়িতেই আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। ভাবিলাম, ললিত যখন গৃহমধ্যে পদার্পণ করিয়াছিল তখনই তো আমার প্রিয়সম্ভাষণে তাহাকে আপ্যায়িত করা উচিত

ছিল, কিন্তু তাহা করা তো দূরের কথা, এমন কি তাহার প্রশ্নের উত্তর পর্য্যন্ত দিই নাই।

যাহা হউক—ললিতের আসিবার কারণ আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না। মায়ের কাছে যে তাহার পত্র দেখিয়াছি। তাহাতে যে আমার মানসরঙ্গিনী—ললিতের সুকুমারী ভগিনী পত্নীরূপে আমার ঘর আলো করিতে আসিবে—তাহাই লিখিত আছে। ললিত আজ শুধু সেই শুভদিনের নির্ঘণ্ট লইয়া উপস্থিত। আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বন্ধুবর্গ সঙ্গীতচর্চ্চা বন্ধ করিয়া দিল এবং যে যেমন বিদায় লইয়া চলিয়া গেল; আমি তখনও নির্ব্বাক! বাকাস্ফূরণের সুবিধা কিম্বা স্পৃহা কিছুই ছিল না। এদিকে ঠাকুর আসিয়া যখন আমায় জিজ্ঞাসা করিল "বাবু খাবারের জায়গা হ'বে কি?" তখন আমি বেশ সটান্ বলিয়া ফেলিলাম "দেখ ঠাকুর, ললিত বাবুর শুদ্ধ জায়গা করো।" ঠাকুর 'যে আজ্ঞা' বলিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিল।

ললিত অমনি বলিয়া উঠিল "ভাই হেমেন, খাবার ব্যবস্থাটা কি আর না করলে চলতো না?" এবার আমি উত্তর দিলাম, নিলর্জ্জের মত এক নিশ্বাসে অনেক কথা বলিলাম। এটাও বেশ বুঝাইয়া দিলাম যে, এ বাড়ী তো তাহার পরের বাড়ী নয়, এটা

যে তাহারই ভগিনীর বাড়ী। এ কথাগুলি বলিবার সময় অবশ্য আমার মুখখানা একটু কালো হইয়া গিয়াছিল, তথাপি কথা শেষ না করিয়া পারি নাই। ললিত হয়তো তখন আমায় কাণ্ডজ্ঞানহীন, লজ্জাহীন—একটী জীববিশেষ বলিয়া ধারণা করিয়াছিল; কিন্তু তথাপি আমার জিহ্বা সংযত হয় নাই। যেটুকু বলিবার তাহা বেশ করিয়া বলিয়াছিলাম। ললিতের ভগিনীকে যে এত ভালবাসি তাহার সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা যে এত প্রবল—তাহাতো কৈ এতদিন অনুভব করি নাই। আজ যেন শুক্‌নো নদীতে দুকূল ছাপাইয়া বান ডাকিয়া গেল। সরমের বালুকাময় 'চর' যেন নিমেষের মধ্যে প্রেমের বন্যায় নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া দিতে একটুও দ্বিধা বোধ করিল না। এতদিন উত্তপ্ত বক্ষ খাড়া রাখিয়াছিল, আজ আর পারিল না। তবে এতদিন কেন সে কনকপ্রতিমার কথা মনে হয় নাই! এক লহমার জন্যও তো এতদিন সেই আলোক-লতার অসামান্য রূপলাবণ্য—এ মোহ-হত চিত্তকে দগ্ধ করে নাই! একদিনের জন্যও তো সেই সুন্দর আসমানী রঙ্গের ফুলের সুগন্ধ আমার মন মাতাইয়া তুলে নাই! জাগরণে তার সুঠাম ছবি আমার নয়নপথে পতিত হইয়া আত্মহারা করে নাই, স্বপনও তো কৈ তাহার কনকচাঁপা অঙ্গুলিস্পর্শে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায়

নাই, রূপের তৃষা—ভালবাসার নেশা তো কৈ আমার হৃদয়কে দগ্ধ করে নাই, তবে আজ কোন্ সাহসে কিসের ভরসায় সেই মুখখানির জন্য এত উচাটন? হায়, অপ্রেমিকের কি তবে এ রাধা-ভজনা বৃথা! না, না, কিছু হয় নাই, কিম্বা মনোবিকার ঘটে নাই—তাহা তো বলিতে পারি না। সে কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। যদি কিছুই না হ'বে—তবে অন্য কোনোস্থানে বিবাহ করিতে চাহি নাই কেন? সুন্দরীর প্রলোভন, অর্থের কামনা কতবার হাসিমুখে পরিত্যাগ করিয়াছি, মাকে আমার কত রকম প্রলাপ অপ্রলাপ বচনে তুষ্ট করিয়া পত্নীলাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছি, এসব কেন করিয়াছি, কেন দিয়াছি—তাহা তো আমার কাছে গোপনীয় নয়;—আর মাথার উপর যিনি অন্তর্যামী আছেন—তাঁহার কাছেও নয়। আমি জানি আর ভগবান জানেন—শুধু শৈলবালার মুখ চাহিয়া—তাহার সহিত মিলনের বাসনা হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া—বাধাবিঘ্নরূপ পর্ব্বতের আড়ালে মাথা লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। মায়ের পত্রে, ললিতের পত্রে ও উপস্থিতিতে আজ পাহাড়ের মাথা গুঁড়ি হইয়া গিয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথা সোজা হইয়া উঠিয়াছে। এত দিন মন আমার কৈবল্যভাবে অবস্থান করিতেছিল। শুধু তন্ময়ত্ব—আমার সুদৃঢ়

বর্ম্মের কাজ করিয়া আসিতেছিল। আজ এক অজানা মন্ত্রশক্তির বলে আমার রক্ষাকবচ—আমার বর্ম্ম—ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। এতদিন উদ্বেগ আমায় আন্দোলিত করে নাই, চিন্তাকীট আমায় দংশন করে নাই, বাসনার বিষ আমায় জর্জ্জরিত করে নাই, প্রেমের হা হুতাশ সহ্য করি নাই—শুধু প্রাণ আমার, আমার ছিল না বলিয়া। আজ কিন্তু ললিত আসিয়া সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে; তাই এত চঞ্চলতা, তাই এত ব্যাকুলতা, তাই এত মর্ম্মপীড়া। শৈলময় প্রাণ আমার যৎসামান্য অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল, পীরিতি-রাহু আমায় সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়াছিল, অনুভবশক্তি তিরোহিত হইয়াছিল; তাই শুধু এতদিন যন্ত্রণার শেলঘাতে ব্যথিত হই নাই, কিন্তু মায়ের আদেশানুযায়ী আমার বিবাহের দিন স্থির করিতে আসিয়া ললিত আমার অস্তিত্বকে টানিয়া বাহির করিয়াছে; আমার পূর্ব্ব-চৈতন্য ফিরাইয়া আনিয়াছে, শৈলময়-প্রাণ—আমার অস্তিত্বকে আহ্বান করিয়া—তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাই—আবার দুঃখের পরিমাণ উপলব্ধি করিয়া চিরআকাঙ্ক্ষার সামগ্রীকে হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাই—এই মর্ম্মবেদনা, তাই—এই উচ্ছ্বাস, তাই—এই আধ আধ বাধ বাধ ভাব। পার্থক্য—যখন শুধু চিন্তা—তখন, ভেদাভেদ যেখানে—উৎকণ্ঠা সেইখানে। পার্থক্য ও ভেদা-

ভেদ—ললিতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই মূর্ত্তিমান হইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সমতা ও একতা ঘুচিয়া বৈষম্য ও নৈরাশ্য তাহাদের বিকটাকার প্রকাশে অণুমাত্র দ্বিধাবোধ করিল না। সেইজন্যই হায়—প্রেমিকের আবেগ, প্রেমের খেয়াল আমার স্কন্ধে চাপিয়া বিভোর ও খেয়ালী করিতে ভুল করিল না বা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিল না।

যাহা হউক—আমরা দু'জনে পাশাপাশি খাইতে বসিয়াছি, আর করুণাময়ী জননী তাঁহার সমস্ত করুণাটুকু পাখার বাতাসের ভিতর দিয়া আমাদের উপর বর্ষণ করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে একথা সেকথা কহিয়া ললিতের আহারের একটু আধটু বিঘ্নও উৎপাদন করিতেছিলেন। কথায় কথায় শৈলবালার কথাও উঠিতেছিল, আমি তখন সত্য বলিতে কি, বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতে-ছিলাম। কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি দেখিয়া আমি বলিলাম "মা, এ তোমার কেমন ধারা? ভদ্রলোক খাচ্ছে, খাওয়া দাওয়া হোক তারপর না হয় যা জিজ্ঞাসা ক'রবার করো।" মা অমনি তাঁর স্বভাবকোমল করুণবচনে বলিলেন "হাঁরে হেমা, তোর আক্কেল আর হবে কবে? ললিত কি আমার কাছে ভদ্রলোক; ও যে আমার—তোরই মত আর এক ছেলে। তোরা যতই বড় হ'না

যতই মান সম্ভ্রম বাড়ুক না কেন—আমি যে তোদের মা। তোরা আমার কাছে পুত্র বই আর কিছুই নয়।" মায়ের আমার কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। বুঝিলাম সন্তানদের মঙ্গলকামনায় মায়ের হৃদয় উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। মা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা ললিত, তাহলে শৈল মায়ের আমার—সংসারের ভার নেবার ইচ্ছা আছে, কেমন, নয় রে? আহা, মা আমার বড় শান্ত, বড় সুলক্ষণা। সেবার বর্দ্ধমানে মা সর্ব্বমঙ্গলার পূজো দিতে গিয়ে তোমাদের বাড়ী হয়ে ফিরেছিলুম। মাকে আমার তখন হতেই বড় ভাল লেগেছে। হাঁরে ললিত, তোকে যে বিয়ের দিন স্থির ক'রবার জন্য লিখেছিলুম, সে তো করেছিস্ বাবা? আহা, বেশ মানাবে এখন। মায়ের যেমন রূপ, তেমনি গুণ। আমার ত[illegible] হ'লে -।" আমার বড় লজ্জাবোধ হইতেছিল—কিন্তু শৈলবালার প্রসঙ্গ কেমন শুনিতেও ভাল লাগিতেছিল, তাই এতক্ষণ কোনো বাধা দিই নাই, এখন আর বাধা না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। মন সরে না—তথাপি সরম নিজের বড়ত্ব বজায় রাখিবার জন্য আমার মুখ দিয়া—আমার অজ্ঞাতে গোটাকতক কথা বাহির করিয়া দিল। তাই বলিলাম "মা ঘটকালির কি তোমার সময় নেই, ওসব ক'রতে হয় তো অন্য একটা সময় দেখে ক'রলে ভাল হয় না?"

স্ত্রীলোকের মন—আবার তাতে আমার মায়ের মন। 'সময় দেখে ক'র্লে ভাল হয়' শুনেই বলে উঠ্লেন "হেমা, ঠিক বলেছিস্, এসব শুভ-কর্ম্মের কথাবার্ত্তা ভাল সময় দেখেই করা উচিত।"

কি হইতে কি হইল? আমি কি বলিলাম আর মা আমার কি বুঝিলেন? এ যে আমি যে দিকে যাই—সেইদিক হইতে আরও জড়াইয়া পড়ি! এ কি আমার দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য? কে বলিয়া দিবে, হায়, আমায় এ কথা কে বলিয়া দিবে? ওগো অশরীরী নিয়তি! আমায় বলিয়া দাও এ আমার জোয়ারের ঢেউ না ভাটার টান্? মা যা বলিবেন বলুন আমি কিন্তু বড়ই লজ্জিত হইলাম। ভাবিলাম ললিত বুঝি আমায় বেহায়া ঠাওরাইল। আবার তখনই ভাবিলাম যে কার্য্য উদ্ধারের জন্য বিজ্ঞেরা লজ্জা, সরম, মান, অভিমান পরিত্যাগ করা উচিত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তবে আর কি? আমি তাহা হইলে বিজ্ঞেরই মত কার্য্য করিয়াছি। বিজ্ঞ বলিয়া ঠিক না স্বীকার করিলেও—বিজ্ঞের দ্বারা প্রশংসিত এ কথাটা তো নেহাৎ অস্বীকার করা যায় না? আর একটা কথা ললিত আমার বন্ধু তার উপর তারই ভগিনীর সহিত আমার বিবাহ হইবে, কাজেই সে বেহায়া মনে না করুক, মূর্খ ও অবুঝ—তাহা তো ভাবিবে না—মনে করিয়া কিছু আশ্বস্ত হইলাম।

তারপর দুইমাস কাটিয়া গিয়াছে। শৈলবালার সহিত আমার বিবাহ হইবে একথা খুব রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। শৈলের নিকটও এ প্রসঙ্গ কিছু অবিদিত নাই। এরই মধ্যে ললিতের সাহায্যে আমার একখানি ফটো শৈলকে পাঠাইয়াছি ও শৈলের একখানি ফটো আনাইয়া লইয়াছি। শৈল এতদিন পরে আমার হইল, আমিও শৈলের হইলাম—ভাবিয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখ ও তৃপ্তি লাভ করিলাম। মানুষের রুদ্ধ বাসনার তৃপ্তিই বুঝি এ মরজগতের চরম সুখ ও পরম আনন্দ। আমি যে ঘরে শুইতাম, ঠিক সেই ঘরে মাথার কাছে চিত্রখানি টাঙ্গাইয়া রাখিলাম। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় চিত্রপানে চাহিয়া চাহিয়া চোখের সাধ, মনের আশা মিটাইতাম, আর ভাবিতাম—যে এই নির্ব্বাক নিস্পন্দ জড়দেহ কখন সচেতনতা লাভ করিয়া আমার দেহ ও মন পবিত্র করিবে, কবে আমার মায়ের সংসারে আসিয়া মাকে সুখসাগরে ভাসাইবে সেদিন কবে আসিবে? ওগো আমার ভাগ্যবিধাতা বলিয়া দাও সেদিন কবে আসিবে?

গ্রীষ্মাবকাশে দেশে আসিয়াছি। পল্লীজননী ফল-ফুলে বিশোভিতা হইয়া যেন কাহার অপেক্ষায় স্থির মৌনভাবে দাঁড়াইয়াছিল। বাসন্তীগগনের চাঁদ, সুগন্ধী বাতাস, পাপিয়ার ডাক, কোকিলের

রব—সব যেন কি একটা আশার নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছিল। আমার মনে হইল বুঝি বা এই হর্ষ, এই শোভা, এই সম্পদ আমার আকাঙ্ক্ষার বস্তু, আদরের ধন,—ওগো কিছু না, শুধু আমার—আমার শৈলকে আমারই গৃহে আনিয়া বসাইবার উদ্যোগে ব্যস্ত। বৈশাখের ২৫শে আমার বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে। ঐ দিন বরবেশে আমি একটী নারীহৃদয় জয় করিয়া গৃহে আনিব। হয়-তো মিথ্যা কথা বলিলাম। বিজয়মাল্য আহরণ করিতে গিয়া হয়তো পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইব। তা হোক, এ পরাজয়ের যে গৌরব, এ পরাজয়ের মধ্যে যে জয়, এ পরাজয়ের যে বিমল আনন্দ—তাহা যদি পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিতে পারি, তাহা হইলেও তো আমার সম্পূর্ণ লাভ। সংসারী আমি, স্বার্থপর আমি—তাই লাভ-লোকসানের তৌল লইয়া সর্ব্বদা লাভ লোক-সান খুঁজিতে ব্যস্ত।

মা যে আমার সুখী হইবেন, মায়ের যে আমার দুঃখ দূর হইবে—এই যে আমার যথেষ্ট আনন্দ। এই আনন্দে ভরপুর হইয়া আমি দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলাম। উৎকণ্ঠায় দিনগুলি যেন আমার কাছে—না, না আমার কাছে কেন সকলেরই কাছে বড়ই দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়। তাই আমার দিনগুলি কাটিতেছিল

না। সন্ধ্যার সময় ঘরে বসিয়া ভবিষ্যতের কল্পনা-জগতে যখন পুলকিতচিত্তে ভ্রমণ করিতেছিলাম, কত সুখের রাজত্ব কত রকমে গড়িয়া তুলিতেছিলাম, কত ফুল-ফলে নয়নারাম শোভায় শোভিত করিতেছিলাম, তখন আমার জননী ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিলেন "হেমা, সুশীলাকে আন্‌বার জন্য কাল দিন হয়েছে, তুই একবার যেতে পার্‌লে ভাল হোত।" মায়ের অনুরোধ অথচ শাসনবাক্য কর্ণে প্রবেশ করিল সত্য, কিন্তু ভাবজগতের রাজা তখন আমি, তাই আমার হৃদয়ে বাস্তবজগতের ছায়াপাত হইয়াও হইল না। অন্যমনস্কভাবে বলিলাম "হু"। মা আমার সহজে ছাড়িবার নহেন, তাই বলিলেন "হেমা তুই পাগল হবি না কি?" মা শেষে আমায় পাগল ঠাওরাইলেন! কোথায় কোন্ স্বপনের-পারা এক-খানি ঢল্‌ঢলে মুখ কবে দেখিয়াছি মনে হয় না, কিন্তু সেই মুখখানি আমার আত্মবিস্মৃতি আনয়ন করিয়াছে। মাও আমার আমায় প্রেমমুগ্ধ কাণ্ডজ্ঞানবিহীন কার্য্যাক্ষম ভাবিলেন. মনে হইতেই আমি বলিলাম, "মা তুমি দেখ্‌ছি আমায় কোনোকথা একটু সুস্থির-চিত্তে ভাবতেও দেবে না?" তা যাক, কি বল্‌ছিলে তাই বল এখন।" মায়ের বাক্যস্ফুরণের পূর্ব্বেই বাড়ীর সরকার কি সব হাট-বাজার করিবে—তাহার ফর্দ্দ লইয়া উপস্থিত হইল। মা সর-

কারকে লইয়া 'নীচে আসিলেন। কথাটা এখন চাপা রহিল। প্রতিহত চিন্তা দ্বিগুণবেগে আমার হৃদয়খানি জুড়িয়া বসিল। আমি কোথায় আমাকে হারাইয়া ফেলিলাম বুঝিলাম না।

তারপর আরও সাতদিন চলিয়া গিয়াছে। সুশীলা তার শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছে। বলা বাহুল্য আমি গিয়াই সুশীলাকে নিয়া আসিয়াছি। আরও অনেক আত্মীয়-কুটুম্বের আগমনে আমাদের গৃহপ্রাঙ্গন এখন সর্ব্বদাই মুখরিত। সবে এক সপ্তাহ মাত্র—কিন্তু প্রাণে যেন একযুগ বলিয়া এই সপ্তাহটাকে মনে হইতেছিল। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে কেবল মাত্র উঠিয়াছি, এমন সময় একখানি তার লইয়া সরকার গৃহে প্রবেশ করিল। টেলিগ্রাম হাতে দেখিয়া আমার সমস্ত শরীর অবশ হইয়া গেল; মুখও পাংশুবর্ণ হইল। শরীরের রক্তচলাচল বন্ধ হইয়া গেল। মনে হইল বুঝি কোনো সর্ব্বনেশে সংবাদ লইয়া তারখানি আমায় গ্রাস করিতে আসিয়াছে। সরকারের হাত হইতে ক্ষিপ্রগতিতে তারখানি লইয়া খুলিয়া ফেলিলাম। কাগজখানির উপর পেন্সিলের লেখা যে আমার ভাগ্যলিপি—তাহা তখনও বুঝি নাই। কাগজখানি উল্টা-ইয়া যাহা দেখিলাম তাহা অবর্ণনীয়। সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া গেল। চোখে আঁধার দেখিলাম, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম।

সকলে ছুটিয়া আমার ঘরের মধ্যে আসিল। আমার জ্ঞান ছিল, চোখও চেয়েছিলুম। বুদ্ধিমতী মা আমার সমস্ত বুঝিলেন। বলিলেন "বাবা, শৈলের বুঝি শক্ত ব্যারাম ?" ক্ষীণদৃষ্টিতে, কম্প্রবুকে, শূন্যজ্ঞানে আমার বাক্‌রোধ হইয়া আসিল ; তথাপি যেন কম্পিত ওষ্ঠ একটু নড়িয়া আস্তে আস্তে 'শৈল নাই' কথাগুলি বাহির করিয়া দিল। চারিদিক হইতে শুনিলাম, 'নাই, নাই, আমার শৈল নাই' বাহির হইতে একটা দমকা বাতাস আসিয়া আমার কাণের কাছে 'নাই' বলিয়া ঝটিতি বাহির হইয়া গেল। নিশ্বাস-প্রশ্বাসে বেশ জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলাম। বাহিরে আসিয়া জ্বালা জুড়াইব ভাবিতেছি, এমন সময়ে ললিত দীননেত্রে মলিনবেশে আসিয়া প্রেতের ন্যায় আমার সম্মুখে দাড়াইল। কথা কহিবার অবসর না দিয়াই আমি সংজ্ঞা হারাইলাম, শুধু একটি বার 'নাই' বলিয়াই মাটিতে পড়িয়া গেলাম।

সম্পূর্ণ।

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০	১১	দাঁড়াইয়া	চটিয়া
১৫	১৬	গর্ত্তে	গহ্বরে
১৯	১১	মরতে পারিনি	মারতে পারেনি
২৫	১৪	আমার	আবার
২৫	১৬	আগাও	আগু
২৬	১৬	খাঁটি	খাঁটিজ
২৯	২৪	যখন	যখনকার
৬৪	১	বাঁধা	বাঁধন
৭০	৪	মাঝে মাঝে —	মাঝখানে
৭৬	২	লাগলুম	লাগলো
৮১	১৩	মূর্খের	মূকের
৮১	১৫	হাস্য মুখে	হাসি মুখে

গ্রন্থকারের দুইখানি ঐতিহাসিক নাটক

১। মোগল-বাদসা

(শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে)

২। উত্থান-পতন

(যন্ত্রস্থ)